পরাবিদ্যার সার।

পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য

শ্রীমৎ স্বামী অচ্যুতানন্দ সরস্বতী

বিরচিত।

শান্তিপুর নিবাসী

শ্রীযুক্ত গণেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

কলিকাতা

১৯৫ ১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীটস্থ শ্রীদেবকীনন্দন প্রেসে

শ্রীযুক্ত পুলিন বিহারী দাস দ্বারা

মুদ্রিত

সম্বৎ ১৯৭২।

মূল্য ৷৹ বার আনা মাত্র

সূচীপত্র।

বিষয়।		পত্রাঙ্ক

পরাবিদ্যার সার।

—ঃ ঃ—

মুখবন্ধ ও উপোদ্ঘাত।

এক স্বমাত্মা পুরুষঃ পুরাণঃ
সত্যঃ স্বয়ং জ্যোতি রনন্ত আদ্যঃ।
নিত্যোঽক্ষরোঽজস্র সুখো নিরঞ্জনঃ
পূর্ণোঽদ্বয়ো মুক্ত উপাধিতো মৃতঃ

এইক্ষণে দেখিতেছি অপরাবিদ্যা লইয়াই বসুধার ও যে সমস্ত শিক্ষিত লোক আপন জীবনের লীলা খেলা করিতেছেন যে পাশ্চাত্য জাতি অভ্যুদয়ের অন্তিম সীমায় উপনীত বলিয়া বিখ্যাত, তাহারাও অপরাবিদ্যার আপাত-রমণীয় লাবণ্যে আত্মহারা। ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে, বিত্তৈষণা ও লোকৈষণার কারুকার্য্যে পৃথিবী এমন বিমোহিত

হইয়া পড়িয়াছে যে, কিছুতেই লোকের অন্তর্দৃষ্টি খুলিতেছে না। কাযেই এই বাসনা যুগপৎকে চরিতার্থ করিতে তৎপর হইয়া মানুষ বিজ্ঞান, রাজনীতি, সমাজ তত্ত্ব, অর্থশাস্ত্র ও যুদ্ধবিদ্যা লইয়া ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে এইরূপ অবস্থাতে অবশ্যই পরাবিদ্যার কথা অনেক স্থলে অরণ্যে রোদন বলিয়া গণ্য হইলেও এক বারে নিষ্ফল নহে, কেনন ইহা বিদ্যুৎ গতিতে অধিকারীর মনে সঞ্চারিত হইয়া পরিবর্ত্তন লইয়া না আসিলেও ধীরে ধীরে প্রকৃত উদ্দেশ্যের দিকে তাহার মনকে না আনিয়া ছাড়ে না। বিশেষতঃ বাঙ্গালা সাহিত্যের এই যৌবন অবস্থাতে ঋষি সঙ্ঘসেবিত ব্রহ্মবিদ্যা যদি বাঙ্গালীর পক্ষে উপেক্ষিত জিনিষ বলিয়াই পরিগণিত হয়, তবে বড়ই লজ্জার কথা প্রেমের কাহিনী ও উপকথা লইয়া অথব কল্পনার নীলিমাময় আকাশে ভাবের বেলুন উড়াইয়া কাল হরণ করা অপেক্ষা যুক্তি তর্কের বজ্রসার স্তম্ভে জ্ঞানের প্রাসাদ নির্ম্মাণের চেষ্টা যে একটা হেয় জিনিষ ইহা কোন প্রকারেই বিচারশীল ব্যক্তির মন মানিয়া লইতে চাহে না তবে আমার মত লোকের পক্ষে জ্ঞানের অবতারণা করা নিশ্চয়ই শ্লাঘার কথা বলিয়া গণ্য হইতে পারে না যাহাই হউক ব্রহ্মবিদ্যা আমার অতীব প্রিয় জিনিষ, সুতরাং ইহার ধার অভিষিক্ত উপহার আমার দেশবাসীদিগকে দিবার জন্য এতই তীব্র লালসা হইয়াছে যে, যোগ্যাযোগ্য বিচার করিয়া উঠিতে পারিতেছি না।

স্মরণাতীত কাল হইতেই লোক বিশ্বাস বলে জগদীশ্বরকে হৃদয় মনে সংস্থাপিত করিয়া আসিতেছেন। তার এইরূপ কৌশল ব্যতিরেকে কখন অজ্ঞ, অশিক্ষিত বা অর্দ্ধ শিক্ষিত ব্যক্তি তাঁহাকে ভক্তি পুষ্পাঞ্জলি দিয়া আপনাকে কৃতার্থ করিতে পারে না, কিন্তু বিচার্য্য স্থল এই যে, অনেক কৃতবিদ্য মহোদয়েরাও ভগবৎ প্রাপ্তির মূলে একমাত্র বিশ্বাসকেই দেখিতে পান এই সম্বন্ধে মোটের উপরে ইহা বলিলে অন্যায় হইবে না যে, বিশ্বাসের অর্থ যদি দৃঢ় যথার্থ জ্ঞান হয়, তবে ইহা তত্ত্ব জ্ঞানেরই নামান্তর হইয়া পড়ে, এবং এই বিষয়ে বলিবার কিছুই থাকে না পক্ষান্তরে বিশ্বাস কথাটি বলপূর্ব্বক মানিয়া লওয়া অর্থে ব্যবহৃত হইলে, উহা হইতে ভগবানের যথার্থ জ্ঞান লাভ করা এক প্রকার অসম্ভব বলিয়াই বোধ হয়। কেনন ঐ মানিয়া লওয়াটি বিবেকীর বিচার আহার্য্য জ্ঞান বা তৎসদৃশ একটা কিম্ভুত কিমাকার জিনিষে পরিণত না হইয়া থাকে না

বৈদান্তিক কৃতবিদ্য বুধমণ্ডলী বিচারকেই পরব্রহ্মের যথার্থ জ্ঞানের মূলে দেখিতে পান আর বিচার যে যুক্তি ও তর্কের উপরে প্রতিষ্ঠিত ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। সুতরাং যাঁহারা ব্রহ্মবিদ্যার অমল সলিলে স্নান করিয়া পূত হইতে চাহেন, তাঁহাদিগকে অন্ধ বিশ্বাসী হইলে চলিবে না আর এই স্থলে ইহাও বলিয়া রাখা আবশ্যক যে, ঐ বিদ্যার গবেষণাতে অমার্জ্জিত বুদ্ধি বা স্থূল বুদ্ধি ব্যক্তির হস্তক্ষেপ করা সুসঙ্গত

নহে শঙ্করের ন্যায় কুশাগ্র বুদ্ধি না হইতে পারিলেও বিদ্যারণ্যের মত স্বতন্ত্র প্রজ্ঞার উদয় না হইলে উপনিষদের পুরুষলাভের উপায় নাই এইরূপে যাহাদের মন ভৌতিক বস্তুতে অত্যন্ত আসক্ত, তাঁহাদের বুদ্ধি সূক্ষ্ম হইলেও এই বিষয়ে ফলোদয় হইবার নহে যদিও তাঁহারা সভা সমিতিতে ব্রহ্ম-বিদ্যার বক্তৃতা করিয়া বা পুস্তক ও প্রবন্ধ লিখিয়া বিত্তৈষণা ব লোকৈষণা চরিতার্থ করিতে পারেন, তথাপি ব্রহ্মের অপরোক্ষ অনুভূতিতে বঞ্চিতই থাকিয়া যাইবেন অবশ্যই তাঁহারা আপন মার্জ্জিত বুদ্ধির প্রভাবে শঙ্করভাষ্য, চিৎসুখী বা অদ্বৈতসিদ্ধি পড়িয়া ফেলিতে পারেন, এবং এইজন্য ব্রহ্মের পরোক্ষ জ্ঞান লাভের সুখে অধিকারী হন ; তথাপ তাঁহাদিগকে ব্রহ্মবিৎ-মুনি বলা যাইতে পারে না না—তাঁহাদের উপদেশ শুনিয়া কেহ ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার করিতে পারে অনেক কৃতবিদ্য ব্যক্তি প্রাচ্য পরাবিদ্যায় প্রতিচ্য ভাব মিলাইয়া লিখন বা বক্তৃতার ভঙ্গীতে অপবুদ্ধ পাশ্চাত্য বিদ্যাভিজ্ঞ নব্য সমাজের ভক্তিভাজন হইয়াছেন, ইহা অতীব সত্য, কিন্তু গুরু ও চেলা উভয় শ্রেণীতেই অন্তর্মুখতার অযথাভাব দেখিতে পাওয়া যায় তবে এই শ্রেণী হইতে পরাবিদ্যার প্রতি নব্য সম্প্রদায়ের কুভাব অনেকটা কমিয়া গিয়াছে পড় ব বহি লিখাতে বিচার শক্তি ও বৈশারদ্যের আবশ্যকতা হইলেও উহার প্রতি অন্তর্মুখতা এবং বিশুদ্ধ চিত্ততা যে অন্যথা সিদ্ধ ইহা বলাতে নির্যুক্তিকথা দোষ আসিতে পারে না আর

অসংযতেন্দ্রিয় ও অপূতমন ব্যক্তিও যে পড লিখাতে সিদ্ধহস্ত তাহার অনেক নিদর্শন পাওয় যায়।

যদিও 'না বেদবিন্মনুতে তং বৃহন্তং' শ্রুতি লেখাপড়া না জান লোকের পক্ষেই তত্ত্বজ্ঞান অসম্ভব বলিয় ঘোষণা করিয়াছে, তথাপি উপরাম, বৈরাগ্য এবং অন্তরিন্দ্রিয় ও বহিরিন্দ্রিয়ের সংযম ব্যতীত শ্রোত্রীয় সদ্বংশজাত ব্যক্তিও ব্রহ্ম-দর্শনে মানব-জন্ম সফল করিতে পারেন না সেইরূপ সখের পড়া বা লোকৈষণা ও বিত্তৈষণা প্রণোদিত হইয়া পড়া তত্ত্ব জ্ঞানের দিকে লইয়া যাইতে পারে না, সেইরূপ না পড়াও যে তত্ত্বজ্ঞানের প্রবল অন্তরায় ডাকিয়া আনে এইরূপ সিদ্ধান্তই এইক্ষণে ব্যক্ত হইয়া পড়িল বেদান্তশাস্ত্রের অধ্যয়ন সম্বন্ধে ইহা বলিয়া রাখা আবশ্যক হইতেছে যে, নভেল নাটক পড়ার ন্যায় ইহা পড়িতে পারা যায় না, এমন কি স্থল বিশেষে এক পংক্তি পড়িতেও অন্ততঃ দুই দিনের আবশ্যকতা হইয়া পড়ে সুতরাং মেধাবী অধিকারী ধৈর্য্য ও অধ্যবসায় সহকারে নির্জ্জনে বেদান্ত অনুশীলনে অমর রত্ন লাভ করিতে পারেন অধিকাংশ সময় নির্জ্জনে চিন্তা না করিলে বেদান্তের অভিধেয় হৃদয়ঙ্গম করা সুকঠিন, এইজন্য ঐরূপ অধিকারীকে অবশ্যই একান্ত সেবন করিতে হইবে। এ সঙ্গক্রমে ইহাও ব্যক্ত করা আবশ্যক যে, অন্ততঃ নব্যন্যায়ের "সিদ্ধান্ত-মুক্তাবলীর" সহিত "ভাষাপরিচ্ছেদ" ভাল করিয়া না পড়িলে বেদান্তের গূঢ় বিষয় বোধগম্য হইবার নহে বেদান্তের বিষয় যে অত্যন্ত কঠিন

এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই, কিন্তু সূক্ষ্ম বুদ্ধি অধ্যবসায়ের প্রভাবে তৎক্ষণাৎ না হউক সময়ে উহ বুঝিয়া লইতে পারেন নিবিষ্ট মনে বিচার করিতে থাকিলে একদিন না একদিন, উপনিষৎ প্রতিপাদ্য পুরুষ অবশ্যই ব্যক্ত হইয়া পড়িবেন

পুরাকালে এইরূপ প্রথা প্রচলিত ছিল যে, বৃদ্ধ অবস্থাতে লোক সন্ন্যাস-আশ্রম গ্রহণ করিত এই প্রথা যুক্তিযুক্ত ও বিজ্ঞান সম্মত, কেননা যৌবন অবস্থাতে পশুভাব অপতিহত প্রভাবে মনুষ্য হৃদয় অধিকার করিয়া বসে অনেক নবীন সন্ন্যাসীরাই যে এইজন্য যৌবনে যোগভ্রষ্ট হইয়া পড়েন, ইহার দৃষ্টান্ত সচরাচর পাওয়া যায়। কাযেই গৃহস্থ অবস্থাতে বেদান্ত-শাস্ত্র অধ্যয়ন ও ব্রহ্মবিচারণায় নিযুক্ত হইয়া সন্ন্যাস-আশ্রমের যোগ্যতা লাভ করিতে হইবে বাল্য-সন্ন্যাস ও যৌবন-সন্ন্যাস প্রথাটা বৌদ্ধ ধর্ম্ম হইতে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে ইহা সত্য হইলেও আর্য্যধর্ম্মেও ইহার ব্যাপ্তি দেখিতে পাওয়া যায় 'যদহরেব বিরজে তদহরেব প্রব্রজেৎ' জাবাল উপনিষদই ইহার প্রমাণ অবশ্যই এই উপনিষদ তত প্রাচীন নহে কিন্তু তাই বলিয়া যে ইহা বৌদ্ধধর্ম্মের পরবর্ত্তী এই বিষয়ে কোন অকাট্য প্রমাণ সংগ্রহ করিতে পারা যায় না যেরূপ তরুণ ভিক্ষুগণ আপন আশ্রমের অবিনীত পরিণাম দেখাইয়া শিষ্ট-সমাজের প্রশংসা ভাজন হইতে পারিতেছেন না, তদ্রূপ অশীতি বর্ষে পুত্র বা কন্যার জন্মদাতা হইয়া গৃহমেধী বৃদ্ধ-মণ্ডলীও ঐ সমাজকে আশ্চর্য্যান্বিত করিয়া তুলিয়াছে

কাজেই 'বার্দ্ধক্যে মুনিবৃত্তীনাং' মহাকবির উক্তির উদাহরণ বর্ত্তমান আর্য্যভূমিতে বিরল হইয়া উঠিয়াছে মানুষ যদি জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত পশুভাব লইয়াই লীলা খেলা করিতে থাকে, তবে 'ধর্ম্মোহি তেষামধিকো বিশেষঃ' এই মহাবাক্যের সার্থকতা কোথায় রহিল? কিন্তু বুদ্ধি ঘটিত ব্যাপারে বিদ্যমান পৃথিবী যে পশু হইতে অনেক অগ্রসর হইয়াছে, ইহ স্বীকার করিতেই হইবে আর ইহাও অসত্য নহে যে, পশুদিগকে যদি ভাল করিয়া শিক্ষা দেওয়া যায়, তবে তাহারা মানুষের ন্যায় বুদ্ধির কারকার্য্য দেখাইতে না পারিলেও ঐ সম্বন্ধে তাহাদের অধিক উন্নতি হয়

ঋষিযুগ হইতে বর্ত্তমানযুগে লৌকিক ব্যবহার সম্বন্ধে কোন কোন বিষয়ে আমাদের সমধিক উন্নতি হইলেও আমরা যে দিন দিন পশুভাবের ক্রীতদাস হইতে চলিয়াছি, তাহাতে কি সন্দেহ আছে? আমাদের বড় বড় পুথি পড়া ও ধনকুবের হওয়ার উদ্দেশ্যের দিক দিয়া ভাবিলে ইন্দ্রিয় সেবাই আসিয়া সম্মুখে খাড় হয়। বৈজ্ঞানিক ব্যাপারেরও এইরূপ দশা ঋষিদিগের সময়ে পার্থিব সুখের উপকরণ সংগ্রহ করাতে নৈপুণ্য দেখান একটা বড় প্রশংসনীয় জিনিষ বলিয় পরিগণিত হইত না, এইজন্য যে তাঁহার ইন্দ্রিয় সংযমকে পঞ্চম পুরুষার্থের পরম্পার কারণ বলিয় জানিতেন কাযেই ঐরূপে ইন্দ্রিয় তৃপ্তিজনিত সুখকে উদ্দেশ্য করিয়া প্রবর্ত্তিত বর্ত্তমান অপরা-বিদ্যার তত ব্যাপ্তি ছিলন

বর্ত্তমানযুগে যেরূপ অপরাবিদ্যা স্বাধীন ও অপর তন্ত্র, ঋষি-যুগে সেইরূপ ছিল না পরিণামদর্শী ঋষিগণ বুঝিয়াছিলেন যে অপরাবিদ্যাকে স্বাধীনতা দিলে কখন উহা কুফল উৎপন্ন না করিয়া ছাড়িবেনা কিন্তু ইহাও অসত্য নহে যে, তাঁহারা ইহাকে পরাবিদ্যা দ্বারা এত অভিভূত করিয়াছিলেন যে, ইহা যোগ্যভাবে আত্মপরিচয় দিয়া উঠিতে পারে নাই। যাহাই হউক অপরাবিদ্যাকে যে তাঁহারা স্বাতন্ত্র দেন নাই এইজন্য চিরদিনের তরে বিজ্ঞসমাজ তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ দিবেন। আর ইহাও বিবেচ্য যে বিদ্যমানযুগের অপেক্ষাতে ঋষিদিগের সময়ে অপরাবিদ্যার উন্নতি না হইলেও সেই সময়ের অপরাপর জনসমাজ হইতে তাঁহারা ঐ বিদ্যা সম্বন্ধে অধিক দূর অগ্রসর হইয়াছিলেন। প্রকৃত পক্ষে অপরাবিদ্যাকে পরাবিদ্যার অধীনে না রাখিলে উহার বিষময় ফল অবশ্যম্ভাবী সুতরাং অপরাবিদ্যাকে পরাবিদ্যার অধীন করিয়া যতদূর তাহার উন্নতি হইতে পারে তাহাতেই বিজ্ঞব্যক্তির সন্তুষ্ট হওয়া উচিত আর বর্ত্তমান স্বাধীন অপরাবিদ্যা যে বিষময় ফল প্রসব করিতেছে তাহা কি বর্ত্তমান পাশ্চাত্য বিরাট সমর আমাদিগকে বুঝাইয়া দিতেছে না ? পরাবিদ্যার পক্ষপাতী খ্রীষ্টীয় যাজক-দিগের উপদেশাবলী যদি প্রতীচ্য রাজনীতিক সমাজে অরণ্য-রোদনে পরিণত না হইত, তবে কি ভীষণ নরহত্যার মর্ম্মভেদী-দৃশ্য সদাশয় ব্যক্তির চক্ষু নিপীড়িত করিত। এইত গেল সমর সম্পর্কিত গাথা আবার পাশ্চাত্য সমাজ যে বিলাসিতার

হস্তে আত্ম সমর্পণ করিয়া দৈনন্দিন অসার হইয়া পড়িতেছে ইহাও আমরা পুনঃ পুনঃ শুনিয়া আসিতেছি। এইরূপ অবস্থাতেও যদি আর্য্যভূমির লোক পূর্ব্বজদিগের সুধাময় পরাবিদ্যার দিকে লক্ষ্য না করিয়া প্রতীচ্য অপরাবিদ্যার আপাত-সুন্দর মূর্ত্তি দেখিয়া হতচৈতন্য হইয়া পড়েন, তবে আর অধিক দুঃখের বিষয় কি হইতে পারে?

পরাবিদ্যার প্রভাব মার্জ্জিত বা অমার্জ্জিতরূপে প্রায় পৃথিবীর সমস্ত মানব সমাজেই দেখিতে পাওয়া যায়। অধিকন্তু সভ্য সমাজে ইহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নির্ম্মল, ললাম ও সুশৃঙ্খলা গঠিত। তবে ইহা সত্য যে পরাবিদ্যার সার অদ্বৈতবাদ ভারতবর্ষেই জন্ম গ্রহণ করিয়াছে। যদিও অন্যান্য দেশেও ইহা দ্বারা সমলঙ্কৃত গ্রন্থ রচিত হইয়াছে, তথাপি উহার মূলে ভারতের অদ্বৈত-বাদকেই দেখিতে পাওয়া যায়। আর ইহাতে কোন প্রকার দ্বিভাব নাই যে, ঐ গ্রন্থ আর্য্যভূমির উপনিষদের পরবর্ত্তী। ভারতের অদ্বৈতবাদ বেদমূলক হইলেও অনুভব, বিচার ও যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। অনেকে বলেন যে বৌদ্ধধর্ম্ম হইতে অদ্বৈতবাদ আসিয়াছে, কিন্তু ঐ ধর্ম্মের পূর্ব্ববর্ত্তী বেদ ও উপনিষদে উহা দেখিতে পাই। তবে ইহা সত্য যে গৌড়পাদ ও শঙ্কর হইতে অদ্বৈতবাদ পরিপুষ্ট, প্রসারিত ও যুক্তির অভেদ্য দুর্গে সংরক্ষিত হইয়া আসিতেছে। ইহা বলিলেও অন্যায় হইবে না যে, শঙ্কর ও তদীয় কৃতবিদ্য শিষ্যবর্গের যুক্তি নিরাকরণ করিয়া উঠিতে পারেন এরূপ ব্যক্তি এই অবনীপৃষ্ঠে

বিরুদ্ধ যাঁহারা রামানুজের খণ্ডন দেখিয়া অদ্বৈতবাদকে যুক্তিযুক্ত মানিতে কুণ্ঠিত হন, তাঁহাদিগকে আমি "চিৎসুখী" ও "অদ্বৈতসিদ্ধি" পড়িতে অনুরোধ করি কিন্তু এই গ্রন্থযুগল এত কঠিন যে, অ খিম্বিকী বিদ্যাকুশল মনীষীও স্খলনিশেষে আতঙ্কিত না হইয়া থাকিতে পারেন না যাহা হউক পক্ষপাতশূন্য হইয়া মেধাবী বিজ্ঞব্যক্তি যদি দীর্ঘকাল আধ্যাত্মিক বিষয়ে ধারাবাহিক বিচার করিতে থাকেন, তবে অবশ্যই তিনি বুঝিবেন যে এক অখণ্ড দেশকালে অপরিচ্ছিন্ন বস্তুই অপরিবর্ত্তনীয় নিত্য। সুতরাং যাঁহারা অসংখ্য বস্তুকে নিত্য মনে করিয়া থাকেন, তাঁহারা স্ব অপ্রবুদ্ধ অবস্থায়ই পড়িয়া রহিয়াছেন এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত না হইয়া থাকিতে পারা যায় না।

অদ্বৈতবাদের উপরে দ্বৈতবাদী ও বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী অনেক অভিযোগ আনিয়াছেন, কিন্তু জ্ঞানীর বিচারাগারে ঐ গুলি অকিঞ্চিৎকর বলিয়াই অবধারিত হইয়াছে ভেদবাদীর দল অদ্বৈতবাদকে পরাভব করিতে যাইয়া স্বয়ংই পরাভূত হইয়া পড়িয়াছেন। মনুষ্যের প্রতিদিনের সুষুপ্তি ব্যাপারটাই বুঝাইয়া দিতেছে যে, জীব কার্য্যভূমিতে পৃথক্ পৃথক প্রতীয়মান হইলেও কারণভূমিতে এক অভিন্ন কেন না সুষুপ্তি ভঙ্গের পরে সকলেরই আমি সুখে শুইয়া ছিলাম, কিছুই জানিতে পারি নাই, এইরূপ একই প্রকার স্মরণ হইয়া থাকে সুষুপ্তির ন্যায় সমাধিও অদ্বৈতবাদের

সত্তাতে ডুবাইয়া দেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, ঐ অবস্থাতে উপনীত হইতে পারেন এইরূপ মহাপুরুষ বিরল। যখন সুষুপ্তিতে মনের বিলয়ে সমস্ত জগৎ বিলীন হইয়া যাইতেছে, তখন কোন বিচারশীল প্রবুদ্ধব্যক্তি মন নিরপেক্ষ স্বতন্ত্র বাহ্যজগতের অস্তিত্বকে ভিত্তি করিয়া কবিতাসুন্দরীর পণ্য-বীথিকা সাজাইতে ও বড় বড় পুথি লিখিতে সাহস করিয়া উঠিতে পারেন? তবে কল্পনাপ্রিয় যথেচ্ছাচারী ও ভাবের মাদকতায় বিভোর অপ্রবুদ্ধ লেখকদিগের কথা স্বতন্ত্র। রূপের বাজার ও আকৃতির বাগান গুলি যে ইন্দ্রিয় বোধমাত্র এই বিষয়ে বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক এবং দার্শনিক একমত। উভয়ের মতবৈষম্য কেবল ইহার কারণসম্বন্ধেই দেখিতে পাওয়া যায় যাহারা কার্য্যজগতের তত্ত্ব লইয়াই সর্ব্বদা ব্যতিব্যস্ত, তাঁহারা যদিও অদ্বৈতবাদের মহত্ত্ব ভাল করিয়া বুঝিয়া উঠিতে পারেন না, তথাপি কারণের অন্বেষণে নিবিষ্ট সুধীসমাজ অদ্বৈতবাদকে একটা অগণ্য জিনিষ বলিয়া মানিয়া লইতে অবশ্যই কুণ্ঠিত হইবেন উপনিষদের সার ও অন্তিম লক্ষ্য অদ্বৈতবাদ যে, বিদ্যমান যুগের কৃতবিদ্য সমাজের হৃদয় আলোকিত করিতে পারিতেছে না, তাহার কারণ এইক্ষণে বহির্মুখতা অপ্রতিহত প্রভাবে জনসমাজের হৃদয়ে রাজত্ব করিতেছে তার বহির্মুখ ব্যক্তি অন্তরতম তত্ত্বকে যে ধরিয়া লইতে পারে না ইহার অনেক নেক উদাহরণ পাওয়া যায়। যাহা হউক, এইক্ষণে কৃতবিদ্য সমাজ অদ্বৈত-

বাদকে আদরের জিনিষ বলিয়া গ্রহণ না করিতে পারিলেও ভবিষ্যতে উহা যে ঐ সমাজের উপরে প্রভুত্ব করিবে এইরূপ সম্ভাবনাকে অলীক কল্পনায় পরিণত করিতে পারা যায় না, এইজন্য যে উহা অনুভবের উপর সংস্থাপিত হইয়া যুক্তির অজেয় পরিখায় পরিবেষ্টিত রহিয়াছে। আর ভবিষ্যতে যে অনুভব ও যুক্তির দ্বারা নিরূপিত সত্যই বিজ্ঞসমাজে স্থান পাইবে তাহার পূর্ব্বসূচনাও আমাদের সম্মুখে বিদ্যমান, আর যখন ব্রহ্মবিদ্যার ক্রমবিকাশ যাহারা অদ্বৈতবাদে পরিসমাপ্ত হইয়াছে দেখিতে পাই, তখন উহাকে পরাবিদ্যার সার বলাতে অন্যায্যতা দোষ আসিতে পারে না

তত্ত্বজ্ঞানের আবশ্যকতা।

সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় যে মানুষ অজ্ঞান অবস্থাতে কোন প্রকারে পরম শান্তি লাভের অধিকারী হইতে পারেন আর ঐরূপ না হইতে পারিলে মানবজীবনের অমূল্যরত্নবিশিষ্ট সম্পত্তিই অলব্ধ অবস্থাতে পড়িয়া থাকে ভৌতিক বিদ্যার অনুশীলনে অর্থ, কীর্ত্তি, সাময়িক চিত্তপ্রসাদ ও ভৌতিক পদার্থের জ্ঞান লাভ করিতে পারিলেও উহা হইতে কোন প্রকারে মনকে সংযত ও পরিশুদ্ধ করিতে পারা যায় না নীতি, দর্শন ও মনোবিজ্ঞান অবশ্যই উহাকে ঐরূপ করিয়া তুলে,

এবং তত্ত্বানুশীলনের যোগ্যত আনিয়া দেয়, কিন্তু ঐ অবস্থাতেও উহ অপ্রশান্তই থাকিবা যায় না যাইবে কেন, জানিবার মূল জিনিষটা যে অপরিদৃষ্টই রহিয়া যাইতেছে। ঐ জিনিষ যতদিন পর্য্যন্ত অপ্রত্যক্ষ থাকিবে, ততদিন মনুষ্যের মনে জ্ঞান লালস কিছুতেই নিবৃত্ত হইতে পারে না আর এই লালসা যে মানব মনকে শান্তিতে লইয় আসিতে পারে না ইহা ব্যক্তকরার কোন আবশ্যকতা নাই সৎকর্ম্ম হইতে মনুষ্য উন্নত অবস্থায় উপনীত হইতে পারিলেও মৌলিক তত্ত্বের সাক্ষাৎকার ন হওয়ার জন্য তাহাকে অশান্তির গঞ্জন সহ্য করিতেই হইবে অনেকের মতে নিষ্কাম কর্ম্ম হইতে লোক শান্তি লাভের অধিকারী হয়, কিন্তু আমাদের বিচার শক্তি ইহাই বুঝাইয়া দেয় যে, নিষ্কাম কর্ম্মের যথাযথ অনুষ্ঠান তত্ত্বজ্ঞান লাভের পরেই সম্ভবপর কেননা হৃদয় গ্রন্থি ছিন্ন ন হইলে অন্ততঃ লোকৈষণার ষড়যন্ত্র হইতে অব্যাহতি পাওয় অত্যন্ত কঠিন বর্ত্তমান সময়ে অনেক নিষ্কাম কর্ম্মকারীরাই উহার ষড়যন্ত্রে পড়িয়া ঠিক পথে চলিতে পারিতেছেন না। তবে ইহা সত্য যে এমন নিষ্কাম কর্ম্মবীরও আছেন, যাঁহাকে কোন প্রকার বাসনা স্পর্শ করিতে পারে ন এই সম্বন্ধে আমরা অধিক বলিতে চাহিন এই জন্য যে হিন্দুর মহামান্য গীতাই নিষ্কাম কর্ম্মবিষয়ে তন্ন তন্ন করিয় বিচার করিয়াছেন বিজ্ঞব্যক্তিরা বিবেচনা করিবা দেখ উচিত যে, যখন একমাত্র বিচারই মূল বস্তুর পরিজ্ঞানে অব্যভিচারী

কার্য্যপ্রণালী নির্দিষ্ট হইয়াছে, তাহা কি প্রকারে সে কর্ম সে বস্তুর দর্শন জনিত শান্তিকে লইয়া আসিতে পারে? তবে ইহা সত্য যে তত্ত্বজ্ঞানের পরবর্ত্তী নিষ্কাম কর্ম্ম পরম শান্তির সহচর, কেন না ঐ জ্ঞানের উদয়ে বাসনা নির্ম্মূল হইয়া যায়। কাজেই যাঁহারা নিষ্কাম কর্ম্মের সেবক হই। মনুষ্য জন্ম সফল করিতে চাহেন, তাঁহারা প্রথমে তত্ত্বজ্ঞানলাভের জন্য চেষ্টা করুন।

উপাসনা উপাস্য দেবতায় মনকে স্থির করিয়া দেয়, কিন্তু জ্ঞানপিপাসা নিবৃত্ত করিতে পারে না। কাজেই জ্ঞানপিপাসা থাকিতে মনে যে শান্তি আসিতে পারে না, তাহা অনায়াসে বুঝা যায়। আর অধিকাংশ উপাসকগণ যে উপাস্য দেবতার দর্শন লাভ করিতে পারেন না, বলিয়া দুঃখিত হইয়া থাকেন তাহারও উদাহরণ পাওয়া যায়। এইরূপে উপাস্য বস্তুতে মন না লাগিবার নিমিত্তও উপাসককে আত্মগ্লানি করিতে দেখিতে পাওয়া যায়। ফলকথা সগুণ ব্রহ্মের উপাসনা অন্তঃকরণকে শুদ্ধ করিয়া দেয়, কিন্তু তত্ত্বজ্ঞানজ শান্তি আনিয়া দিতে পারে না। সগুণ ব্রহ্মের উপাসনার ন্যায় নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসনাও উপাসককে ঐ শান্তির অধিকারী করেন। এই জন্য যে, উহা কেবল পরব্রহ্মের পরোক্ষ জ্ঞানের অপেক্ষা রাখে বলিয়া অপরোক্ষানুভূতির অভাব জনিত অবসাদ তাহার মনে থাকিয়া যায়। যে কোন উপাসনা শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহার অধিকারী অতত্ত্বজ্ঞানী। কেনন তত্ত্বজ্ঞানের অর্থ স্বয়ং প্রকাশ এক অখণ্ড চিন্ময় আত্মার সাক্ষাৎকার হওয়াতে

ঐ অবস্থাতে উপাসক, উপাস্য ও উপাসনা এইরূপ ভেদভাব সম্বন্ধে ত্রিপুটীর কোন অংসর থাকে না। তবে ইহা সত্য যে জ্ঞানকে ধারাবাহিক করিবার জন্য তত্ত্বজ্ঞানীকেও জ্ঞানাভ্যাসে নিযুক্ত হইতে হইবে, অর্থাৎ অনাত্মাকার মনোবৃত্তি না হইতে দিয়া উহাকে ঐরূপ আত্মায় মিলাইয়া ফেলিতে হইবে। এইরূপ যে তত্ত্বজ্ঞানী করিতে পারেন তাঁহাকেই স্থিতপ্রজ্ঞ মুনি বলা যায়।

বর্ত্তমান সময়ে যাহা ভক্তি বলিয়া বিখ্যাত, উহা বৈদিক যুগের উপাসনা ভিন্ন অপর জিনিষ নহে। ঐ উপাসনাই নবভাবে সংযোজিত হইয়া ভক্তি আখ্যা লাভ করিয়াছে। যত ভাবের ভক্তি আছে তন্মধ্যে মাতৃ ও পিতৃ ভাবের ভক্তিই উৎকৃষ্ট, এই জন্য যে ইহাতে অপবিত্রতা আসিতে পারে না। ভাগবতে যে অহৈতুকী ভক্তি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে উহা সংপ্রজ্ঞাত সমাধীরই নামান্তর মাত্র। জিজ্ঞাসু বা পরোক্ষ জ্ঞানীর পক্ষে পরব্রহ্মে অহৈতুকী ভক্তি পরম হিত আনয়ন করে। এই ভক্তির প্রভাবে তিনি অনাত্ম বস্তু হইতে মনকে চিদাত্মায় লাগাইয়া ক্রম নীতিতে বিচারে অগ্রসর হইলে তাহার সাক্ষাৎকার করিতে পারেন। ব্রহ্মসাক্ষাৎকার না হওয়া পর্য্যন্ত জিজ্ঞাসু ভক্তিরসে বিভোর হইয়া থাকিবেন। আর ব্রহ্মদর্শনের পরে ধারাবাহিক রূপে ঐ দর্শনকে যদি কেহ ভক্তি নাম দিতে চাহেন, তবে তাহাতে আমাদের কোন আপত্তি নাই। কেননা ইহাতে নামের বৈলক্ষণ্য ব্যতিরেকে বস্তুগত কোন বৈষম্য দেখিতে পাওয়া যায় না।

তত্ত্বজ্ঞান ব্যতীত এমন কোন জিনিষ অনুসন্ধানে পাওয়া যায় না, যাহা ব্রহ্মাতিরিক্ত বস্তুর জিজ্ঞাসা, লাভ এবং উপাদেয়ত্ব সিদ্ধ হইতে পারে কেননা তত্ত্বজ্ঞানে যেরূপ সর্ব্ব পরিজ্ঞান হয়, সেইরূপ মায়া ও মায়িক বস্তু যে স্বতন্ত্র স্বরূপাদিরূপে ত্রিকালে নাই এইরূপ বাধক জ্ঞান আপনা আপনিই আসিয়া যায় এক মূল বস্তুকে ধরিয়া লইতে পারিলে যে কার্য্য ভাবাপন্ন নিখিল বস্তুর আসল তত্ত্ব বুঝিতে পারা যায় ইহার উদাহরণে সুবর্ণ, তদ্বিবর্ত্তিত কেয়ূর, কুণ্ডল প্রভৃতিকে রাখিতে পারা যায় এই বিষয় উপনিষদে বিশদরূপে বিবৃত হইয়াছে বলিয়া সংক্ষেপে বলা গেল ব্রহ্মসত্ত্বাই যে মায়া এবং মায়িক বস্তুর সত্ত্বা ইহা প্রবুদ্ধ ব্যক্তি অনায়াসে বুঝিয়া থাকেন কিন্তু অপ্রবুদ্ধ মেধাবী জিজ্ঞাসু ও শুক্তিরজত ও রজ্জুসর্পরূপ ভ্রান্তি স্থলের তন্ন তন্ন করিয়া বিবেচনা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারিবেন যে, শুক্তি ও রজ্জুর সত্ত্বা ব্যতিরেকে রজত ও সর্পের স্বতন্ত্র সত্ত্বা নাই। কাযেই মায়া ও মায়িক পদার্থ ব্রহ্মসত্ত্বা হইতে পৃথক সত্ত্বাশূন্য বলিয়া মিথ্যা ও ভ্রান্তি বিজৃম্ভিত আর যাহা অসত্য, উপাদেয় মনে করিয়া তাহার জন্য লালায়িত হওয়া কখনও যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না যখন ব্রহ্মাতিরিক্ত জিনিষ অসত্য অবধারিত হইল, তখন এই জিনিষ সম্বন্ধে কোন কোন তত্ত্ব জানিয়া মানুষ কি প্রকারে আপনাকে সত্যদর্শী বলিয়া মনে করিতে পারে? কাযেই সত্য বস্তুর পরিজ্ঞান না হইলে যে মানব মনে জ্ঞান

পিপাসা বলবতী থাকিবে তাহাতে কি সন্দেহ আছে? এইরূপ অবস্থাতেও যাহারা মায়িক বস্তুর কিঞ্চিন্মাত্র তত্ত্ব জানিয়া পরিতৃপ্ত হইয়া রহিয়াছেন, তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ না দিয়া থাকিতে পারা যায় না। তবে ভ্রান্তি অবস্থাতে যে গিল্‌টিই স্বর্ণ প্রাপ্তির আপ্যায়ন লইয়া আইসে ইহা অতীব সত্য। আর ইহাও অসত্য নহে যে, যেখানে দলে দলে ভ্রান্ত, সেইখানে দুই এক জন বিশেষদর্শীর কথা অরণ্য রোদনে পরিণত না হইয়া থাকে না। কিন্তু তাই বলিয়া যে বিশেষদর্শীকে ভ্রান্তি জ্ঞানের অপনোদনে তটস্থ হইতে হইবে তাহা নহে। কেনন অনেক স্থলে দেখিতে পাই, বিশেষ দর্শনের কথা ভ্রান্ত ব্যক্তির শ্রোত্রবিবরে পুনঃ পুনঃ প্রবিষ্ট করাইলে অবশেষে তাহাকে প্রমাজ্ঞান আসিয়া আলিঙ্গন করে। এইরূপে মায়িক বস্তুকে সত্য বলিয়া জানা ভ্রান্তি ভিন্ন অপর কিছু বলা যাইতে পারে না, এইজন্য যে তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হইলে উহা অসত্যে পরিণত হইয়া পড়ে। এইস্থলে কেহ মনে করিবেন না যে মায়িক জগৎ তাঁহার প্রতীয়মান হয় না, কেনন তিনি অজ্ঞানীর ন্যায় সত্য বলিয়া ইহাকে না দেখিলেও আকাশে নীলবর্ণের মত মিথ্যারূপে অনুভব করিয়া থাকেন। বেদান্তশাস্ত্রে এইরূপ ভ্রান্তিকে সোপাধিকভ্রান্তি বলে। নীলাকাশস্থলে উপাধি দূরত্ব এবং জগৎভ্রান্তি স্থলে শরীরারম্ভক প্রারব্ধ নিরূপিত হইয়াছে ফলকথা আত্মসত্তা ব্যতিরেকে জগতের স্বতন্ত্র নাই এরূপ অটল জ্ঞানও তদ্ভাবে জ্ঞানী ও অজ্ঞানী বিভক্ত হইয়া থাকে।

তত্ত্বজ্ঞানের অর্থ মূল সত্যবস্তুর পরিজ্ঞান, সুতরাং ইহার অভাবে যেরূপ কিছুতেই মানবের জ্ঞান লালসা মিটিতে পারে না, সেইরূপ ইহা ব্যতীত প্রকৃত মনুষ্যত্বেরও উদয় অসম্ভব মানুষ যদি জীবনের প্রত্যেক মুহূর্তে ইহার অভাবের খেলাই খেলিতে থাকে, তবে তাহার মনুষ্য জন্মলাভের গৌরব কোথায় রহিল ? যাহা বিশেষ দর্শন অবস্থাতে মিথ্যা বলিয়া প্রতীয়মান হইয়া থাকে তাহার পরিচর্য্যা করিয়া দুর্লভ মানব জীবনকে শেষ করা কখন শ্লাঘনীয় বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। বিচার শীল ব্যক্তিকে একান্তে ভাবিয়া দেখা উচিত যে, ইন্দ্রজালের বিনোদে আত্মহারা হইয়া থাকা কতদূর যুক্তিযুক্ত ? যাহা ক্ষণভঙ্গুর মনোবিলাস মাত্র, তাহার তরে জীবন উৎসর্গ করা এবং সদ এক রস নিখিল বস্তুর সার চিদাত্মাকে ভুলিয়া যাওয়া কি বিবেকের অনুমোদিত ? যশোবৃত্তি, বর্ণবৃত্তি ও ধনবৃত্তির দাসত্বে কাল অতিবাহিত করার সঙ্গে সঙ্গে অপরা বিদ্যার দুই দশখানি গ্রন্থ পড়িলেই যে মানব জন্ম সফল হয় না এই সত্যকেই ব কি প্রকারে অনাদর করিতে পারা যায় ? যদিও এই পৃথিবীতে অপরা বিদ্যার আবশ্যকতা আছে, তথাপি তাহা হইতেই যে প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভ করিতে পারা যায় না ইহ অবিসংবাদিত সত্য বর্তমান কৃতবিদ্য ও শিক্ষিত সমাজে যাহা দেখিতে পাই, তাহা পরম পুরুষার্থের অন্তরায় ডাকিয়া আনিতেছে। লোকৈষণা প্রণোদিত হইয়া কোন হিতকর কার্য্যে নিযুক্ত হওয়া আপেক্ষিক ভাবে অনবদ্য হইলেও ঋষিদিগের উদার ভাবের

দিক দিয় দেখিলে ইহা অবদ্যে পরিণত না হইয়া থাকে না তবে ইহা সত্য যে এই যুগে ইহাকে উচ্চ আসনে বসাইতেই হইবে কিন্তু যাহাদের নাড়ীতে অদ্যাপি আর্য শোণিত বহিতেছে, তাঁহারা যদি পরম পুরুষার্থকে ভুলিয়া ইহাকেই মনুষ্য জীবনের অন্তিম উন্নতি বুঝিয়া লন, তবে আমরা কিছুতেই তাঁহাদিগকে ভ্রম প্রমাদশূন্য আপ্ত মনে করিতে পারিব না। কেননা ব্রহ্মবিদ্যার অনুশীলনে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করাই আর্য্য জীবনের অন্তিম লক্ষ্য আর এই জন্যই অনার্য্য জীবন হইতে আর্য্য জীবনের বিশিষ্ট মহিমা অনির্দ্দিষ্ট কাল হইতে জনসমাজে প্রথিত হইয়া আসিতেছে এই স্থলে ইহা অপরিহেয়রূপে বিবেচ্য যে, ঐ লক্ষ্যকে ভুলিয়া জীবন যাত্রায় অগ্রসর হইতে থাকিলে, এই পৃথিবীতে আর্য্য জীবনের গৌরব কত দিন অপরাপর জীবনে কি তথাকথিত হিতকর কার্য্য আর্য্য জীবন অপেক্ষা অধিক দেখিতে পাওয়া যায় না ? যে পরম ধর্ম্ম আর্য্য জাতি গঠিত করিয়াছে তাহাকে বিদায় করিয়া দিলে ঐ জাতির অধঃপতন বা সমূলে বিনাশ অবশ্যম্ভাবী বিজ্ঞান, প্রত্নতত্ব ও ভূতি জগরাবিদ্যায় প্রতীচ্য জাতির সহিত প্রতিযোগিতা, কি অবিলম্বেই আমরা করিতে পারিব ? কে বলিতে পারে, এই সম্বন্ধে আমাদের কত সময় লাগিবে ? কোন বিজ্ঞ ব্যক্তির বিচারে অধ্রুবের প্রত্যাশায় ধ্রুব বস্তুর পরিহার যুক্তিযুক্ত বলিয়া নিরূপিত হইতে পারে ? তবে ইচ্ছা করিয়া অন্ধ গো-লাঙ্গুল নীতি অনুসরণে প্রবৃত্ত হইলে স্বতন্ত্র কথা।

লোকনীতিতে দেখিতে পওয়া যায় কেহ যদি আপনার দোষগুণের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া অপরের দোষগুণের সমালোচন করিতে যায়, তবে সে বিজ্ঞসমাজে নিন্দিত না হইয়া থাকেন কিন্তু বর্ত্তমান শিক্ষিত সমাজের কয় জন আপনার বিষয় ভাবিতে অবকাশ পান অতি অল্প লোকের মনেই এইরূপ প্রশ্ন আসে যে, আমার প্রকৃত স্বরূপ কি, আমি কি ভাব সমষ্টি মাত্র অথবা প্রত্যেক ভাবে অনুস্যূত ভাবাতীত এক রস স্বয়ং প্রকাশ চিন্ময় সাক্ষী ? সার্দ্ধ ত্রিহস্ত শ্রীমূর্ত্তির রূপ লাবণ্যের গৌরব বা নিজের বিত্ত, বুদ্ধি ও কৃতি প্রভৃতি লইয়া ভাবাকেই বা কি প্রকারে আত্ম চিন্তন বলা যাইতে পারে ? কেননা এই সমস্ত জিনিষ আত্মাকে অবলম্বন করিয়া উৎপত্তি মাত্রেই বিলীন হইয়া যাইতেছে গৃহিণী, গৃহ, ধন, জন সকলই ইন্দ্রিয় বোধ ব্যতীত অপর জিনিষ নহে, সুতরাং এই গুলিও ক্ষণস্থায়ী এবং আত্মাকে আশ্রয় করিয়া জন্ম লাভ করে। কাযেই এই সকল বস্তুর ভাবনা অবশ্যম্ভাবী হইলেও ইহার সঙ্গেই আত্মচিন্তন করিতে হইবে আর স্বয়ং প্রকাশ জ্ঞান-রূপ আত্মা যে প্রত্যেক জিনিষের প্রকাশক ও আসল স্বরূপ ইহাতে কোন সন্দেহ না থাকিলেও তত্ত্বজ্ঞান না হইলে কিছুতেই ইহা উপলব্ধ হইবার নহে

তত্ত্বজ্ঞান শব্দের অর্থ যে মূল সত্যবস্তুর পরিজ্ঞান ইহা পূর্ব্বে বলা গিয়াছে, সুতরাং যে জ্ঞান মায়িক বা অমৌলিক জিনিষকে বিষয় করিয়া প্রবর্ত্তিত হয় তাহাকে ঐ বস্তু বর্ণ

যাইতে পারে না। আর মূল সত্য বস্তু সম্বন্ধে পরে বিশিষ্ট-রূপে বিচার করা যাইবে। পরন্তু এই স্থলে ইহ বলিয়া রাখা আবশ্যক যে, ঐ বস্তু জীব এবং অপরাপর নিখিল জিনিসের আসলস্বরূপ, সুতরাং উহাকে জানিতে পারিলেই সকল বস্তুর মূলতত্ত্ব ধরিয়া ফেলিতে পারা যায়। উপনিষদে ইহাকে এক বিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞান সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে, এইজন্য অনেক ধর্ম্মপুস্তকে দেখিতে পাওয়া যায় যে জ্ঞানীর প্রশংসা করিতে যাইয়া লেখক সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বদর্শী প্রভৃতির ব্যবহার করিয়া ফেলিয়াছেন। যাহা হউক তত্ত্বজ্ঞান যে জীবকে শিব করিয়া দেয় তাহাতে কোন আশঙ্কা নাই।

মূল সত্য বস্তু কি ?

মূল সত্যবস্তু সম্বন্ধে কত গবেষণ চলিয়াছে, চলিতেছে ও চলিবে তাহার ইয়ত্তা করিতে পারা যায় না। যদিও এই সম্বন্ধে অনেকানেক মতভেদ দেখিতে পাওয়া যায়, তথাপি মনুষ্যের প্রত্যক্ষ জ্ঞান যাহাকে ধরিয়া ফেলে তাহা লইয়া বিসম্বাদ করা অতীব অন্যায়। কিন্তু এই স্থলে ইহাও বিবেচ্য যে প্রত্যক্ষ জ্ঞান সকল সময়েই যথার্থ হয় না, ভ্রান্তিও ইহার আকার ধারণ করিয়া বসে। এইজন্য প্রথমে প্রমাপ্রমার বিশ্লেষণ করিয়া পরে প্রমিতির বিষয়কে গ্রহণ করিয়া লওয়াই বিচক্ষণতার কার্য্য। আর ইহ অতীব সত্য যে ভ্রান্তিজ্ঞানের

পরমাণুটা বিশেষ দর্শন না হওয়া পর্য্যন্ত অর্থাৎ যে পর্য্যন্ত বস্তুর বিশেষ তত্ত্ব জানিতে না পারা যায় সেই পর্য্যন্তই ভ্রান্তি জ্ঞান বর্ত্তমান থাকে। কাযেই এইরূপ অবস্থাতে যাঁহারা ভ্রান্তিজ্ঞানের বালুকাময় বেদিতে সত্যবস্তুর সংস্থাপন করিতে চাহেন বা করিয়াছেন তাঁহাদের ঐ বেদি অবশ্যই একদিন না একদিন বিশেষ দর্শনের নির্ঝর আসিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিবে

মূলবস্তু কখনও সাকার হইতে পারে না এইজন্য যে এমন সাকার বস্তু দেখিতে পাওয়া যায় না যাহা উৎপত্তি ও বিনাশের দায় এড়াইয়াছে। এইরূপে তাহাকে সগুণ নিরাকার বলাতেও বস্তুতঃ ব্যাঘাত দোষ আসিয়া পড়ে, কেনন গুণ সাবয়ব পদার্থেই দেখিতে পাই। নৈয়ায়িক ও বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিকের যে নিরবয়ব পরমাণু বা অতি পরমাণুর পরিমাণাদি গুণ স্বীকার করিয়াছেন তাহা অভ্রান্ত নহে এইজন্য যে, ঐ উভয়ই অতীন্দ্রিয় বলিয়া অজ্ঞেয়তার অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন। আর মূল জিনিসটাই যখন ঐরূপ, তখন তাহার গুণাবলী যে সুবিস্পষ্ট ইহা কি প্রকারে ধারণা করিয়া উঠিতে পারা যায়? এই স্থলে অনুমিতির অনুরাগীদিগকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া যাইতেছে যে, অপ্রত্যক্ষ বস্তুর অনুমান অপ্রামাণ্য আশঙ্কা হইতে কিছুতেই অব্যাহতি পাইবার নহে কাযেই অতিপরমাণুকে কিরূপে বৈজ্ঞানিকগণ ধরিয়া লইলেন, তাহা আমার মত অবৈজ্ঞানিকের পক্ষে বুঝিয়া উঠা অতি কঠিন

যখন নিরাকার বস্তুকে সগুণ বলাতে দোষ আসিয়া থাকে,

তখন বাধ্য হইয়া তাহাকে নির্গুণ বলিতে হইবে এই জন্যই উপনিষদে দেখিতে পাই 'সাক্ষী চেত কেবলে নির্গুণশ্চ' যেরূপ ঐ বস্তুকে সাকার ও সগুণ বলিতে পারা যায় না, তদ্রূপ তাহাকে জ্ঞান, ইচ্ছা বা কৃতির বিষয় বলিয়া ধারণ করাও বাতুলতা মাত্র, কেননা নিখিল বিষয়ই ক্ষণোৎপন্ন ও ক্ষণবিনাশী। সুতরাং দাঁড়াইল যে ঐ জিনিষটা জ্ঞান, ইচ্ছা ও কৃতির অন্যতর। পরন্তু ইচ্ছা ও কৃতি জ্ঞানের বিষয় হয় বলিয়া অবশেষে উহাকে জ্ঞানরূপ বলিতে হইবে যদিও কোন কোন দার্শনিকের মতে জ্ঞানও জ্ঞানান্তরের বিষয় হইয়া থকে, তথাপি জ্ঞান স্বয়ং প্রকাশ এক অখণ্ড হওয়াতে এইমতকে ভ্রম প্রমাদ শূন্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারা যায় ন অভিজ্ঞান ও নকুল জ্ঞানের বিষয়াংশকে বাদ দিয়া নিরবচ্ছিন্ন জ্ঞানের দিক্ দিয়া দেখিলে ঐ দুই জ্ঞানের কোনরূপ পার্থক্য খুঁজিয়া পাওয়া যায় না এইরূপে তাহাকে স্বপ্রকাশ না বলিলে অপর জ্ঞানোৎপত্তির পূর্ব্বে বিষয়ের বিকাশ অসম্ভব হইয়া উঠে, এই জন্য যে আপনি অন্ধকারাচ্ছন্ন থাকিয় কখনও অপর জিনিষকে প্রকাশ করিতে পারা যায় ন প্রদীপ স্বয়ং প্রকাশ বলিয়াই গৃহের অন্যান্য জিনিষকে প্রকাশ করিয়া দেয় আর যখন এক বিষয়ের জ্ঞান হইতে অপর বিষয়ের জ্ঞানে কোন পার্থক্য এবং জ্ঞান শূন্য কাল অনুসন্ধানে পাওয় যাইতেছেন, তখন জ্ঞানকে এক ও নিত্য বলিতে হইবে কাজেই এইরূপ জিনিষ অখণ্ড না হইলে চলে না, এই জন্য যে সখণ্ডতা বিষয়েই দেখিতে

পাওয়া যায় তবে যাহারা জ্ঞানকে নাম ও অনিত্য মনে করে, তাহারা বিষয়ের অনিত্যত ও নানাত্ব জ্ঞানে আরোপ করিয়া লয় এই স্থলে এইরূপ এক কঠিন আপত্তি আছে যে, বিষয় হইতে অতিরিক্ত যে জ্ঞান আছে তৎসম্বন্ধে কোন প্রমাণ নাই, কেন না এই লেখনী এই পুস্তক এইরূপই জ্ঞানের আকার হয়, আর এই আকারে লেখনী ও পুস্তক হইতে স্বতন্ত্র এমন কোন জিনিষ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, যাহাকে বিষয় হইতে অতিরিক্ত জ্ঞান বলা যাইতে পারে পরন্তু এই স্থলে অপ্রবুদ্ধ ব্যক্তি বিষয়াতিরিক্ত জ্ঞানকে ধরিয়া না লইতে পারিলেও আমি লেখনী জানিতেছি, এবং আমি পুস্তক জানিতেছি এইরূপ অনুব্যবসায় জ্ঞানে অথবা আমি লেখনী জানিতেছিলাম প্রভৃতি স্মৃতি জ্ঞানে, জ্ঞান যে বিষয় হইতে পৃথক্ একটা স্বতন্ত্র জিনিষ ইহা তিনিও বুঝিতে পারেন। কেনন, ব্যবসায় জ্ঞানটা বিষয়ের সহিত এত জড়সড় হয় যে, অপ্রবুদ্ধ অবস্থাতে তাহার পৃথক্ত্ব অনুভব করা কঠিন ব্যাপার হইয়া উঠে এই স্থলে ইহাও বলিয়া রাখা অনাবশ্যক নহে যে ব্যবসায় জ্ঞানটা অতত্ত্বজ্ঞানীর পক্ষেই এই পুত্র এই গৃহিণী এইরূপ আকারের হইয়া থাকে, কিন্তু তত্ত্বজ্ঞানীর পক্ষে দণ্ডভাসমান কমণ্ডলু ভাসমান এইরূপে ঐ জ্ঞান হয় যাহাই হউক এই বিষয়টা অপ্রবুদ্ধ ব্যক্তিকে বুঝাইয়া দেওয়া অত্যন্ত কঠিন আর ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে, জ্ঞানকে যথাযথ রূপে বুঝিয়া উঠা তত্ত্বজ্ঞান না হইলে সম্ভবপর নহে।

জ্ঞানের বিষয় ক্ষণ বিনাশী এইজন্য অপ্রবুদ্ধ অবস্থাতে অভ্যাস বশে বিষয়ের ধর্ম্ম জ্ঞানে মজিয় অনেকেই এইরূপ অপ সিদ্ধান্তে আসিয়া থাকেন যে, জ্ঞান অনিত্য। এইরূপে উহাকে নির্গুণ ও নিষ্ক্রিয় দেখিয়া তাঁহারা নিত্য আত্মার অনিত্য গুণ বলিয় ও ধারণা করিয়া বসিয়াছেন আবার জ্ঞান ও ইচ্ছা প্রভৃতি বিশেষ গুণের সম্পর্কে আপাময় আত্মার প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ করিতে পারে, এইরূপ অপরূপ কল্পনাও তাঁহাদের দেখিতে পাই কিন্তু জ্ঞান ব্যতীত কোন নিত্য বস্তু অনুসন্ধানে পাওয়া যায় না, এইজন্য তাহাকে অনিত্য মনে করা, এবং নিখিল বস্তুর আধাররূপ জ্ঞানের কোন অপর আধার নাই বলিয়া। তাহাকে গুণ বলিয়া মানিয়া লওয়া কতদূর যুক্তি সঙ্গত, তাহা বিজ্ঞ সমাজ স্বয়ংই বুঝিয়া লইবেন। পক্ষান্তরে অজ্ঞান অবস্থাতে যখনই মনোবৃত্তি স্থির করিয়া আত্মচিন্তায় নিযুক্ত হওয়া যায়, তখনই গুণের প্রবাহ ছাড়া অপর কোন জিনিষ অনুসন্ধানে পাওয়া যায় না, কাযেই ঐ অবস্থাতে আত্ম প্রত্যক্ষট গুণ প্রত্যক্ষে পরিণত না হইয়া রহিল না। প্রকৃতপক্ষে তত্ত্বদর্শন না হইলে কিছুতেই মানুষ গুণের চতুঃসীমা অতিক্রম করিতে পারে না সে যতই চেষ্টা করুক না, কোন প্রকারে গুণের বন্ধন হইতে অব্যাহতি পাইবার নহে। তবে ইহা সত্য যে, গুণের সত্ত্বাকেই অনেকে অতিরিক্ত গুণী বলিয়া ধরিয় লন, কিন্তু বিশেষদর্শীর বিচারে উহাতে অপ্রসার বাহাদুরীই সাব্যস্ত হইয়া থাকে। সুতরাং ইহা প্রতিপন্ন না হইয়া রহিল না যে,

অপ্রবুদ্ধ অবস্থায় মনুষ্য কোন প্রকারে দ্রব্য প্রত্যক্ষ করিতে পারে না। কেন না জ্ঞাতা ব্যতিরেকে দ্রব্য বলিয়া অপর কোন জিনিষ প্রমাণিত হয় না। তাহাকে বাদ দিয়া যে কোন বস্তু লইয়া বিচার করিতে প্রবৃত্ত হওয়া যায়, তাহাতেই কেবল গুণের স্তর দেখিতে পাওয়া যায়। বহির্জগতে রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ ও স্পর্শের রাজত্ব এবং অন্তর্জগতে সুখ দুঃখ প্রভৃতির অবিরাম সংগ্রাম।

জ্ঞান যেরূপ নিত্য বস্তু, সেইরূপ তাহাকে সত্তার সহিত তাদাত্ম্যশালী বলিতে হইবে, কেনন সত্তাকে যদি জ্ঞান হইতে পৃথক জিনিষ বলা যায়, তবে তাহাকে ভৌতিক পদার্থের ন্যায় জ্ঞানের বিষয় হইয়া আত্ম সাক্ষ্য দিবার জন্য অনিত্য না করিলে চলিবে না। আর তাহাকে সকলেই একবাক্যে নিত্য বলিয়া স্বীকার করে, এইজন্য ঐরূপ বলাতে উন্মত্ত প্রলাপের অভি-যোগ আসিয়া উপস্থিত হয়। কাযেই সত্তা ও জ্ঞান একই জিনিষ এই বেদান্ত সিদ্ধান্তেরই বিজয় লাভ হইল। যাঁহারা সত্তাকে জ্ঞান হইতে স্বতন্ত্র জিনিষ বলিয়া মানেন, তাহাদিগ-কেও উহা প্রতিপন্ন করিবার জন্য জ্ঞানের শরণ লইতে হয়। কেন না, জ্ঞানের ধর্ম্ম স্বপ্রকাশত্ব সত্তার স্বীকার করিলে জ্ঞান ও সত্তার ভিন্নত্ব, যাহা কেবল নামের স্কন্ধেই আরোহণ করিয়া বসে, অর্থাৎ কেবল নামমাত্রেই ভিন্নত হইয়া থাকে। এইরূপ অবস্থাতে প্রাপ্তাপ্রাপ্ত বিবেকন্যায়ের নীতিতে সত্তাকে জ্ঞানের অন্তঃপাতী করিয়া লওয়াই ন্যায্য। আর জ্ঞান এক

অখণ্ড অসঙ্গ ব্রহ্ম হওয়াতে সত্তার উহাতে পরিণত না হইয়া রহিল না। এইজন্যই উপনিষদে দেখিতে পাই 'সত্যং জ্ঞানং ব্রহ্ম'।

সত্তার ন্যায় আনন্দও ব্রহ্মজ্ঞান হইতে পৃথক বস্তু নহে পরন্তু উপনিষদের ব্রহ্মতাদাত্ম্যশালী আনন্দ লৌকিক আনন্দ হইতে ভিন্ন জিনিস, এইজন্য যে ইহা উৎপত্তি বিনাশের স্রোতে ভাসিয়া যাইতেছে ঐ আনন্দ যদিও অতত্ত্বজ্ঞানীর বোধগম্য নহে, তথাপি উহার ব্যাখ্যাতে নিখিল দুঃখ ভাবরূপ শব্দের প্রয়োগ করিতে পারা যায়। তত্ত্বজ্ঞানী আনন্দরূপ সত্তা তাদাত্ম্য-শালী চিন্ময় পরব্রহ্মের ধারাবাহিক অনুভূতিতে প্রবৃত্ত হইয়া ত্রিবিধ দুঃখকে সুদূর পরাহত করিয়া ফেলেন কাযেই যাঁহারা এই আনন্দ উপভোগ করিতে চাহেন তাঁহাদিগকে প্রথমে ব্রহ্মজ্ঞানের শাণিত শস্ত্রে অবিদ্যার বন্ধন সমূলে ছিন্ন করিতে হইবে

জ্ঞান সম্বন্ধে জড়বাদীদিগের সিদ্ধান্ত বিপরীত তাঁহারা ইহাকে জড়ের সাময়িক গুণ বলিয়াই বুঝিয়াছেন। কিন্তু আমরা অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়াও ইহার কোন সারবত্তা খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিলাম না যেমন জ্ঞান ব্যতিরেকে জড় প্রতি-পন্ন করিতে পারা যায় না বলিয়া, জ্ঞানকে অবশ্যই জড়ের পূর্ব্ব ভাবী বা সহভাবী বলিতে হয়। পৃথিবীতে এমন জিনিষ নাই বলিলেই হয়, যাহার কোন না কোন জ্ঞানের গোচর নহে কাজেই ইহা প্রতিপন্ন না হইয়া রহিল না যে, জড় মাত্রেই

জ্ঞানে প্রতিভাসিত। সুতরাং জ্ঞান নিরপেক্ষ জড় প্র পায় না হওয়ায় তাহাকে কোন প্রকারে মৌলিক পদার্থ বলিতে পারা যায় না

যখন জ্ঞান মূল সত্য বস্তু বলিয়া প্রমাণিত হইল, তখন তাহাকে বুঝিবার সকল অন্তরায় নিদূরিত প্রায় কেননা উহা সূর্য্যদেবের ন্যায় স্বয়ং প্রকাশ বলিয়া একমাত্র অনাদি অবিদ্যার আবরণ ভঙ্গেরই আবশ্যকতা তত্বজ্ঞানের প্রভাবে যখন এই আবরণ অদৃশ্য হইয়া যায়, তখন জ্ঞানদেব আপনা আপনি প্রকাশিত হইয়া পড়েন অপ্রবুদ্ধ ব্যক্তির যে স্বয়ং প্রকাশ জ্ঞান রূপ ব্রহ্মাত্মাকে ধরিয়া লইতে পারেন না, তাহার প্রধান কারণ তাহারা অবিদ্যার আবরণে সমাচ্ছন্ন আছেন। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকিলে কি নলিনীনাথের মহিমা বুঝিতে পারা যায়? এইরূপে অখণ্ড চিন্ময় ব্রহ্মাত্মা স্বয়ং প্রকাশ হইয়াও জীবের সম্বন্ধে অপ্রকাশিত রহিয়াছেন। যদি অজ্ঞান অবস্থাতেও সামান্যরূপে তাঁহাকে সকলেই জানে, তথাপি বিশিষ্টরূপে জানিয়া কেহ কৃতার্থ হইতে পারে না আর মানুষ যতদিন পর্য্যন্ত তাঁহাকে বিশেষরূপে জানিতে পারে না, ততদিন সে যদি গৌতম, উদয়নাচার্য্য বা কুমারিলের ন্যায় দার্শনিক হয়, তথাপি তাহাকে অবশ্য জ্ঞাতব্য বস্তুর অপ্রাপ্তিজনিত অবসাদ ভোগ করিতেই হইবে

মহাশব্দ বা অনাহতধ্বনি যেরূপ সামান্যরূপে প্রতিভাত হইয়াও অনেকের পক্ষে বিশিষ্টরূপে অজ্ঞাতই থাকিয়া যায়,

তদ্রূপ স্বপ্রকাশ চিন্ময় আত্ম সম্বন্ধেও বটে , কেননা আমি ঐ জিনিষ জানিতেছি ইহা জানিতেছি না এইরূপে ভাবাভাবের জ্ঞানকে সকলে ধরিয়া ফেলিলেও উহা যে এক অখণ্ড, নিখিল বস্তুতে অনুস্যূত এবং জীবের আসল স্বরূপ এই লোকোত্তর দিব্যতত্ত্ব একমাত্র তত্ত্বজ্ঞানীর পক্ষেই অনুভূত হইয়া থাকে পরন্তু ব্রহ্মজিজ্ঞাসু মাত্রেরই অনুব্যবসায় জ্ঞানের প্রতি সবিশেষ লক্ষ্য রাখা উচিত ফলকথ অবিদ্যার আবরণে আবৃত হওয়াতে ঐরূপ আত্মা সম্বন্ধে অতত্ত্বজ্ঞানীর অনুপেক্ষাত্মক না হইয়া উপেক্ষাত্মক জ্ঞানই হইয়া থাকে। আর এইরূপ জ্ঞান কখন আপন বিষয়ের সমস্ত খবর আনিয়া দিতে পারে না। কাযেই বলিতে হয় যে, জানিয়াও চিন্ময় আত্মাকে লোকে জানিতেছে না। পক্ষান্তরে যে সমস্ত বিষয়ে তাহাদের অনুপেক্ষ জ্ঞান হয়, তত্ত্বজ্ঞানীর পক্ষে সেই সকল বিষয় কেবল উপেক্ষ জ্ঞানেই ভাসমান এইরূপে জ্ঞানী ও অজ্ঞানীর সম্বন্ধে অনুপেক্ষ ও উপেক্ষ জ্ঞানের বিষয়সমূহ পরস্পর বিপরীতভাবে রহিয়াছে

যদ্যপি মূল জিনিষ বুঝিতে পারিলে অমূল জিনিষ আপনা আপনিই ব্যক্ত হইয়া পড়ে, তথাপি অবিশেষদর্শীর বুঝিবার সুবিধা হইবে বলিয়া স্বতন্ত্ররূপে ঐ সম্বন্ধে আলোচন করা যাইতেছে যাহা পরিবর্ত্তিত হইতেছে, তাহাই অমূল জিনিষ। পরব্রহ্ম ছাড়া এমন বস্তু নাই যাহা পরিবর্ত্তনের স্রোতে ভাসিয়া না যায়। জীব বল আর প্রকৃতি বল কিছুই বিচারে অপরি-

বর্ত্তনীল জিনিস বলিয়া সাব্যস্ত হয় না। চিদাভাস বা চিৎ প্রতিবিম্বকে বেদান্তশাস্ত্রে জীব বলা হইয়াছে, কিন্তু আভাস ও প্রতিবিম্বের পরিবর্ত্তন যে জল ও দর্পণ প্রভৃতি উপাধির পরিবর্ত্তনে হইয়া থাকে তাহার উদাহরণ যেখানে সেখানে দেখিতে পাই। প্রকৃতি যে, মহৎ, অহংকার ও পঞ্চতন্মাত্র প্রভৃতির আকারে পরিবর্ত্তিত হয় ইহাও অশাস্ত্রীয় নহে। তবে মূলপ্রকৃতির বিকৃতি হয় না এইরূপ যাহা দেখিতে পাই সেই বিষয়ে বিবেচনা করিয়া দেখিলে ইহা অবধারিত হয় যে, অবিকৃত মূলপ্রকৃতির প্রবৃত্তি নিমিত্ত পরব্রহ্ম ব্যতীত অপর জিনিস নহে। একটি স্বতন্ত্র জড়রূপা ঐরূপ প্রকৃতি রহিয়াছে এই কথার মূলে কোন যুক্তি নাই, কেননা জ্ঞান নিরপেক্ষ জড় প্রতিপন্ন হয় না বলিয়া ঐ প্রকৃতিকে জ্ঞানাশ্রিত বলিতে হইবে, আর ইহাতে তিনি অস্বতন্ত্র না হইয়া রহিলেন না।

এইরূপে অন্তরিন্দ্রিয় ও বহিরিন্দ্রিয়ের বেদ্য বস্তু মাত্রই পরিবর্ত্তনে অঙ্গ ঢালিয়া দিয়াছে বলিয়া অমূল জিনিষ। কিন্তু সকল স্থলে পরিবর্ত্তনকে আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারি না, আমরা মনে করি যে ধন, জন, বাগান, বাড়ী প্রভৃতি সময়ে পরিবর্ত্তিত হইলেও নির্দ্দিষ্ট কালের জন্য অপরিবর্ত্তিত অবস্থাতেই থাকে, প্রকৃত পক্ষে তাহা নহে, কেনন ঐগুলি ইন্দ্রিয়বোধ ব্যতীত অপর জিনিষ নহে বলিয়া উহার পরিবর্ত্তনে ঐগুলির পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং একই জিনিসকে বারম্বার উপলব্ধি করিয়া থাকি এই ধারণাটার মূলে অপ্রমাণই দেখিতে

পাওয়া যায় এইজন্য যে, বস্তুজ্ঞানের পূর্ব্বে ও পরে বস্তু বর্ত্তমান থাকে এই সম্বন্ধে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না মানুষ কেবল তুল্যরূপে বস্তুজ্ঞানের পুনরাবৃত্তিজনিত ভ্রান্তির অন্ধ পরম্পরায় পড়িয়া প্রমাণ ব্যতিরেকেই বস্তুর অজ্ঞাতসত্তা মানিয়া লয়

অজ্ঞাতসত্তা মানিয়াও বর্ত্তমান বিজ্ঞান বুঝাইয়া দিতেছে যে পরমাণু ব অতি পরমাণুর আগমন ও নির্গমনে বাহ্য বস্তুর প্রতিক্ষণে পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে, কিন্তু কয়জন ইহাকে বুঝিয়া উঠিতে পারে ? অশিক্ষিত লোকের কথা দূরে থাকুক, অনেক শিক্ষিত মহোদয়েরাও নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য ইহাকে স্থায়ী মনে করিয়া থাকেন এই স্থলে পরিমাণের হ্রাস হয় না বলিয়া বাহ্য বস্তুকে সাময়িকভাবে স্থায়ী জানাতে কেবল ভ্রান্তিরই শ্রীবৃদ্ধি হইয়া থাকে, কেনন নব পরমাণু বা অতিপরমাণুর পুনরাগমনে প্রাক্তন পরমাণু বা অতিপরমাণুর নির্গমন জনিত অভাবের পূরণ হইয়া পড়ে এই পরমাণুর সম্পর্কিত ব্যাপারটি অতীব আশ্চর্য্য জনক এইজন্য যে, ইহা লোকের মনে বস্তুর স্থায়ী-ভাবের ধারণ অবিকল রাখিয়াই নিজের পরিচয় দিয়া থাকে। এইরূপে বৈজ্ঞানিক বা দার্শনিক, যে কোন ভাবে, দেখা যাউক 'চিদাত্মা' ব্যতিরেকে অপর সকল বস্তু যে পরিবর্ত্তনের অনতি-ক্রমনীয় আবর্ত্তে পতিত ইহাই সিদ্ধ হইয়া পড়ে পরন্তু অজ্ঞাত সত্তায় বিশ্বাস করিয়া বসিলে সঠিকভাবে স্থূল বস্তুর পরিজ্ঞান এক প্রকার অসম্ভব বলিয়াই বোধ হয়। কেননা

ইহা ইহাতে দ্বৈতবস্তুর অস্তিত্ব ভ্রান্তি সমূলে নিবৃত্ত হইতে পারে না।

ব্রহ্মাতিরিক্ত নিখিল জিনিষ অমূল বস্তু হইলেও ইহার মধ্যে ইতর বিশেষ আছে কোন জিনিষ শুভফল উৎপন্ন করে এবং কোন জিনিষ অহিত লইয়া আসে বিষয়োপরত তত্ত্ব-দর্শীর সঙ্গে মানুষ মুক্তির অধিকারী হয়, আবার দুঃশীল কুলাঙ্গারের সঙ্গে পড়িয়া সে মনুষ্যত্ব হারাইতে বসে এইরূপে অপরাপর বস্তু উহ্য রহিল কিন্তু এই বিষয়ে অনুধাবন করিতে হইবে যে, অমূল বস্তু মানুষের অভীষ্ট সিদ্ধির কারণ হইলেও উহা সত্য নহে। কেননা অনাত্ম বস্তুতে সত্যতাভিনিবেশ হইলে কিছুতেই পরমপদের দিকে যাইতে পারা যায় ন কাজেই সৎসঙ্গ, তীর্থ যাত্রা ব্রতানুষ্ঠান প্রভৃতি সমস্তই পরম পদ প্রার্থীর পক্ষে অসত্য জ্ঞানে করিতে হইবে আর অসত্য জ্ঞান বস্তুর ব্যবহার বন্ধ করিয়া দেয় না শুক্তিতে রজত জ্ঞান অসত্য হইয়াও ব্যাকুলভাবে তৎপ্রতি দ্রুতপদ বিক্ষেপের অবকাশ ঘটাইয়া থাকে

অমূল বস্তু অসংখ্য, সুতরাং তৎ সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয়েরও শেষ করিয়া উঠিতে পারা যায় ন তথাপি ব্রহ্মজিজ্ঞাসুকে মূল বস্তু জানিবার উপযোগী অমূল বস্তুর অভিজ্ঞতাতেই সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে। কেনন তিনি যদি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অমূল জিনিষের পরিজ্ঞানকে লক্ষ্য করিয় জীবন-যাত্রায় অগ্রসর হন, তবে লক্ষ্য সিদ্ধির পূর্ব্বেই তাহাকে ইহলোকের লীলা সম্বরণ

করিতে হইবে　কেননা যেরূপ অমূল জিনিষ ইয়ত্তার অতীত সেইরূপ উহার পরিজ্ঞান এবং তাহার সাধনও বটে আর মহোদধির প্রত্যেক তরঙ্গ গণিবার ন্যায় ইহ যে অসম্ভব তাহাতেই বা কি সন্দেহ আছে ? কাজেই এইরূপ অবস্থাতে সাধারণ রূপে অমূল বস্তু জানিয়া সবিশেষরূপে মূল বস্তু পরিজ্ঞানের চেষ্টা করাই উচিত　এইজন্যই উপনিষদে দেখিতে পাই, "তমেবৈকমাত্মানং বিজানথ অন্যা বাচো বিমুঞ্চথ অমৃতস্যৈষ সেতুঃ।" পক্ষান্তরে যাহাদের ব্রহ্মজিজ্ঞাসা নাই, তাহারাও নিঃশেষে অমূল জিনিষ জানিতে পারে না বলিয়া আপন বিষাদ ব্যক্ত করিয়া থাকে। এমন কি এই বিষাদ এতদূর দুর্বিষহ হইয়া উঠে যে, তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ আত্মঘাত করিতেও কুণ্ঠিত হয় না। যদিও এইরূপ বিষময় ঘটনা ব্রহ্মজিজ্ঞাসুর মধ্যেও বিরল নহে, তথাপি উত্তম অধিকারীকে ব্রহ্মদর্শনের নিমিত্ত অনন্ত যাতনা ভোগ করিতে হয় না, এইজন্য যে ব্রহ্ম স্বয়ং প্রকাশ জ্ঞান ব্যতীত অপর জিনিষ নহে　আর ঐ জ্ঞান এক অখণ্ড বলিয়া ইহাতে অসংখ্যাত ও সাধন সম্পর্কিত বিভ্রাট আসিবার নহে　কেননা ঐ অধিকারী অন্তর্মুখ হইয়া বিচার করিতে থাকিলে অবিলম্বে পরব্রহ্মের অপরোক্ষ জ্ঞান লাভে আপনাকে কৃতার্থ করিতে পারেন　আর এক কথা এই যে ব্রহ্ম হৃদয় মন্দিরে বাস করেন বলিয়া তৎপরিজ্ঞানে বাহিরের উপকরণ সংগ্রহের ঝগড়া নাই　প্রকৃত পক্ষে যখন পরব্রহ্ম মনুষ্যের আপন স্বরূপ, তখন তাঁহাকে ধরিয়া লইতে সবিশেষ

কষ্ট কি? তবে যে আপনাকে জানিতেও অনেক লক্ষনের কষ্ট অনুভব করে, তাহার কথা স্বতন্ত্র

মায়া।

বেদান্তে মায়া অবিদ্যা ও অজ্ঞান একই জিনিস ব্রহ্মে জগৎ ভ্রান্তির কারণত্ব ইহার লক্ষণ। এই মায়াও তাঁহার কার্য্যরূপ জগতের স্বরূপ অনির্ব্বচনীয় সুষুপ্তি অবস্থাতে কারণরূপে এবং জাগ্রত ও স্বপ্ন অবস্থায় কার্য্যরূপে ইহার উপলব্ধি হইয়া থাকে কার্য্যরূপে মায়া অসংখ্য ও ক্ষীয়মান হইলেও কারণরূপে এক ইহা অনাদি হইয়াও তত্ত্বজ্ঞানের উদয়ে অদৃশ্য হয় তত্ত্বদর্শী ইহাকে মিথ্যা জানে আর অতত্ত্বদর্শীরা ইহাকে সত্য বস্তুতেই পরিণত করিয়া যে ব্রহ্মগত ব্যতিরেকে ইহার স্বতন্ত্র সত্তা নাই সত্য, কিন্তু ইহা পরিবর্ত্তন আনিয়া অসংখ্য জগতের রচনা করিয়া লয় মায়া হইতেই জগতের বাহ্য হয়, এইজন্য এবং সুষুপ্তি ভঙ্গের পরে আমি কিছু জানিতেছিলাম না এইরূপ স্মরণ হয় বলিয়া ইহাকে স্বীকার করা হইয়াছে

যাহাই হউক, প্রকৃত বল, শক্তিবল এবং মায়াবল, জগতের

ব্যাখ্যার জন্য উহার একটা পরিণাম উপাদান মানিতেই হইবে

আর এইরূপ একটা পরিণাম উপাদান না মানিলে ব্রহ্মকে নির্বিকার বলা যাইতে পারে না এই বিষয়টার বিশদ ব্যাখ্যাতে ইহা বলিলে অন্যায় হইবেনা যে,যেরূপ সমুদ্রের নিম্নভাগস্থ জল স্থির ও অবিকম্পিত থাকিলে ও উপরের জলে তরঙ্গ ও আবর্ত্ত প্রভৃতি বিকার দেখা যায়, সেইরূপ বিশ্ব সমষ্টির যে ভাগ বিকার প্রাপ্ত বা পরিবর্ত্তিত হইতেছে, তাহাকে মায়া এবং যে ভাগ নির্বিকার সদা এক রস ও স্বয়ংপ্রকাশস্বরূপ তাহাকে ব্রহ্ম বলা হইয়া থাকে, এই দুইভাগকে অবিভক্ত অবস্থায় পরমেশ্বর বা সগুণ ব্রহ্মও বলা যাইতে পারে কিন্তু বৈদান্তিক মনিষীরা বিকার প্রাপ্ত অংশের স্বতন্ত্র সত্তা না দেখিয়া উহা যে মিথ্যা ও অনির্ব্বচনীয় এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যদি কেহ অবিভক্ত সমষ্টিকেই হৃদয়ের অধীশ্বর করিতে চাহেন, তবে বেদান্তের সহিত কোন বিরোধ হইবার নহে এইজন্য যে তিনি ক্রমনীতিতে নির্ব্বিকার অংশকে বুঝিয়া লইতে পারিবেন

অনেকেই আধ্যাত্মিক বিষয় লইয়া বড় বড় গ্রন্থ লিখিয়াছেন, কিন্তু বেদান্তকে বাদ দিয়া এমন পুস্তক দেখিতে পাওয়া যায় না, যাহাতে বিশ্ব সমষ্টির বিকৃত অংশ হইতে নির্বিকার অংশ বিশ্লিষ্ট হইয়াছে তাঁহারা বিকৃত ভাগের মনোবিমোহন কারুকার্য্য দেখিয়া ভাবে এত বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, নির্বিকার অংশ তাঁহাদের বোধগম্যই হইতে পারে নাই আর, যখন

গুণের রাজত্ব বিকৃত ভাবেই প্রমাণিত হয়, তখন যে উঁহার নয়ন সন্তর্পণ লীলা খেলা তাহাদিগকে অচেতন করিয়া আগের দিকে যাইতে দেয় নাই, তাহাতেই বা কি সন্দেহ আছে? কিন্তু ইহা অতীব সত্য যে, গুণের রাজ্যের চতুঃসীমাস্থ উত্তুঙ্গ গিরি-শৃঙ্গ অতিক্রম করিয়া নির্গুণ তত্ত্বের সীমায় পৌছান সহজ ব্যাপার নহে যাহাই হউক মায়াবাদী নির্বিঘ্নে ঐ গিরি-শৃঙ্গ লঙ্ঘন করিয়া নির্গুণ তত্ত্বের শান্তিময় রাজ্যে উপনীত হইতে পারে গুণের গন্ধর্ব্ব নগর কিছুতেই তাঁহাকে বিভ্রমে লইয়া আসিতে পারে না

মায়ার মোহিনী শক্তি অপার, বিশ্বমণ্ডলের যেদিকে দেখা যায় সেই দিকেই মায়ার শক্তি যেন সাজিয়া রহিয়াছে। মায়াই সৌন্দর্য্যের বানারসী সাড়ী পরিয়া কবিকে মাতাইয়া তুলিয়াছে। ইহাই বিজ্ঞানরূপে পরিণত হইয়া বৈজ্ঞানিককে তত্ত্ব আবিষ্কারে নিযুক্ত করিতেছে ইহারই পরিণাম বিশেষ বীর-রসে মাতিয়া বীরকেশরী দুরন্ত সমরে আপন পুণ্য দেখাইতেছে—দেখাইয়া থাকে ইহাই মানুষকে ধনবাসনা, সন্তান বাসনা ও যশো-বাসনায় বান্ধিয়াছে। ইহারই দুর্ভেদ্য ষড়যন্ত্রে পড়িয়া মানুষ অহিতকে মহান্ হিত মনে করে ইনিই বর্ণ রতিতে নায়ককে এত বিমুগ্ধ করিল যে সে আপনাকে নায়িক অনলে দগ্ধ করিতেও কুণ্ঠিত হয় না অজ্ঞ অভিজ্ঞ সকলেই ইহার মোহন মন্ত্রে অবশ হইয়া পড়িয়াছে মায়াই অসাধুকে সাধু এবং সাধুকে অসাধু করিয়া তুলিয়াছে পৃথিবীতে যে মানুষ অপরের গ্রাস কাড়িয়া লইয়া বা বুদ্ধি-যন্ত্রের লুণ্ঠন করিয়া

লক্ষ্মীর বড় পুত্র হইয়া বসিয়াছে এবং এইজন্য অভিমানের সুরা পান করিয়া মাতিয়া রহিয়াছে তাহার মূলেও ইহাকেই দেখিতে পাই কূট নীতি বা জটিল নীতির আদর এবং বিবেক মূল উদার নীতির অনাদর ব্যাপারটাও বুঝাইয়া দিতেছে যে, ইহা মায়ারই প্রেরণা জনিত জগতে যে প্রকৃত ধার্মিক ব্যক্তির স্থান নাই তাঁহাকেও মায়া বিজৃম্ভিত না বলিয়া থাকিতে পারা যায় না তত্ত্বজ্ঞানী ব্যতিরেকে এমন ব্যক্তি নাই বলিলেই হয়, যিনি মায়ার নিখিল বন্ধন কাটিয়া ফেলিয়াছেন

যেরূপ মায়ার বন্ধন সমূলে ছিন্ন না করিতে পারিলে পরম পুরুষার্থের দিকে যাইতে পারা যায় না সেইরূপ ইহার বন্ধনে থাকিলে মানুষ উদারভাবে সুশৃঙ্খলায় ঐহিক উন্নতি করিতে পারে না। বর্ত্তমান সময়ে যে ঐ উন্নতিকে দেশ বিশেষে যৌবনে উপনীত হইয়াও বিপন্ন হইতে দেখা যায়, তাহার মূলেও ঐ বন্ধন রহিয়াছে কাজেই পৃথিবীতে জ্ঞানীর সংখ্যা অঙ্গুলি নির্দ্দিষ্ট এইজন্য পৃথিবীর সকল লোকেই যদি মায়ার বন্ধন কাটিয়া ফেলে, তবে যে কিরূপ ভাব দাড়ায় এইরূপ বিষয়ের মীমাংসা করার সময় এখনও আসে নাই কিন্তু এই সম্বন্ধে ইহা বলিলে অন্যায় হইবে না যে, যখন এইরূপ অবস্থার কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ ও উদাহরণ পাওয়া যায় না, তখন ইহার মীমাংসা লইয়া সময় ব্যয় করা কখন বিচারশীলের কার্য্য বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না পৃথিবীতে জ্ঞানী ও অজ্ঞানী এক সঙ্গে বাস করিয়াছে, করিতেছে ও করিবে তবে ইহা বিবেচ্য যে বর্ত্তমান

সময়ে যে অতত্ত্বজ্ঞানী মহোদয়েরাই রাজ আসন, মন্ত্রী আসন প্রভৃতি সমস্ত উচ্চপদের আসনগুলি অলঙ্কৃত করিয়া বসিতেছেন, এইরূপ প্রণালীতেই যদি সমস্ত ব্যবস্থা চলিতে থাকে, তবে পৃথিবী হইতে বিসম্বাদের জঞ্জাল মিটিবে কিসে? প্রাচীন আর্য্য নীতিতে কিন্তু ইহার বিপরীত ভাব দেখিতে পাই; রাজা, মন্ত্রী এমন কি সেনাপতি পর্য্যন্ত তত্ত্বজ্ঞানী ছিলেন। ঐ নীতিতে এইরূপ বিধানও দেখিতে পাওয়া যায় যে, অতত্ত্বজ্ঞানীর রাজাসন বা মন্ত্রীর আসনে উপবেশন করিবার অধিকার নাই।

ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে, পৃথিবীতে জ্ঞানীর সংখ্যা না বাড়িলে কিছুতেই উদার নীতি প্রবর্ত্তিত হইতে পারে না। যে মায়াতীত পুরুষকে দেখে নাই সে যদি উহার দর্শনকারীর উপদেশে চালিত না হয়, তবে তাহা হইতে কোন না কোন অনর্থের অভ্যুত্থান অবশ্যম্ভাবী। কেন না তাহার পক্ষে মায়ার কুমন্ত্রণাকে বুঝিয়া লওয়া অত্যন্ত কঠিন। যখন সামান্য বিষয়েও অতত্ত্বজ্ঞানীকে বিপথে যাইতে দেখিতে পাই, তখন তিনি যে গুরুতর কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া সুপথেই চলিবেন তাহাতেই বা কিরূপে বিশ্বাস করিতে পারা যায়? অন্ততঃ মনুষ্যমাত্রকে আপন আত্মা বলিয়া না জানিতে পারিলে মানবকল্যাণের তরে জীবন উৎসর্গ ও শত্রুগণের প্রতিকূল কায়মনোবাক্যে সম্পর্কিত ব্যবহার উপেক্ষাই বা কি প্রকারে সম্ভবপর হইতে পারে? তবে এই সম্বন্ধে পাঠকের হৃদয়গ্রাহী বাক্যরচনা ও শ্রোতৃবর্গের উত্তেজনাকারী অভিভাষণের কথা স্বতন্ত্র। তুমি

এইক্ষণে চলিয়া যাও এইরূপ বলা এবং পকেট হইতে ঘড়ী বাহির করিয়া দেখা অসভ্যত ও সভ্যতার সূচনা করে, এইজন্য প্রথম পরিহেয় ও দ্বিতীয় উপাদেয়, কিন্তু ফলের দিক দিয়া দেখিলে উভয়কে একই উপাদান হইতে উৎপন্ন বলিয়া বোধ হয় আর এই স্থলে যদি উপস্থিত ব্যক্তির আত্মতাদাত্ম্য মনে করা যায়, তবে উভয়েরই আত্মলাভ হয় না। এইরূপে আত্মতাদাত্ম্যের প্রসার যত বাড়িবে, ততই মানুষ মানুষের সহিত অভিন্নভাবে ব্যবহার করিবে কিন্তু অর্থরতি কুলরতি ও পদরতি এইরূপ সাম্যভাবে ব্যবহারের পরিপন্থী কাযেই তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া উপাদানের সহিত এইগুলিকে ছিন্নভিন্ন করিয়া ফেলিতে হইবে

যদিও সাধারণের প্রতিকূল ব্যবহার যেরূপ মায়াময়, সেরূপ তদনুকূল ব্যবহারও বটে, তথাপি জ্ঞানীকে প্রথমের পরিহার ও দ্বিতীয়ের গ্রহণ অবশ্যই করিতে হইবে কেননা লোক সংরক্ষণই তাহার জীবনধারণের প্রধান উদ্দেশ্য তবে যিনি অবিরত ব্রহ্মসংস্থিতির জন্য উভয় হইতেই বিরত হইয়াছেন, তাঁহার কথা স্বতন্ত্র; এইরূপে অপরাপর বিষয়ও উহ্য রহিল। আর জগৎ মায়াময় বলিয়া যে যথেচ্ছাচার করিতে হইবে তাহা নহে এইজন্য যে ইহার ফল বিষময় বেদান্তশাস্ত্রে জগৎকে মায়াময় ভ্রান্তিমাত্র বলা হইয়াছে, কিন্তু ভ্রান্তির স্বরূপ ও ফলে ত বিভিন্নতা দেখিতে পাওয়া যায় রজ্জুতে সর্প ভ্রান্তি মনে বিভীষিকা লইয়া আসে আর গিল্টিতে স্বর্ণ ভ্রান্তি

অভিনব সুখের অধিকারী করে, সুতরাং ইহা বুঝিতে বাকি রহিল না যে, জগতের পরিণাম উপাদান মায়া এক হইলেও তাহার কার্য্যের পরিণতি ব্যবহার্য্যত্ব অব্যবহার্য্যত্ব, উপেক্ষ-ণীয়ত্ব গ্রহণীয়ত্ব এবং উৎকৃষ্টত্ব নিকৃষ্টত্ব প্রভৃতি ভেদে অনন্ত।

মায়াকে ও মায়াময় বস্তুকে অনির্ব্বচনীয় বলা যায় এইজন্য যে ঐগুলির সমস্ত অংশ তন্ন তন্ন করিয়া বিশ্লেষণ করিলেও ব্রহ্ম সত্ত্ব হইতে কোন স্বতন্ত্র সত্ত্ব খুঁজিয়া উঠিতে পারা যায় না, এবং জাজ্বল্যমানরূপে ঐগুলি প্রতীতির গোচর ও ব্যবহার জনক হইয়া থাকে এইজন্য শশক শৃঙ্গীর ন্যায় ঐগুলিকে অত্যন্ত অসৎ বলাও সুসঙ্গত নহে। আর শশক শৃঙ্গীর জ্ঞান যে শব্দজ্ঞানের অনুপাতী ও অবস্তুবিষয়ক বলিয়া নির্ব্বিকল্প জ্ঞান পতঞ্জলি হইতে তাহার শিক্ষা পাওয়া যায় অনির্ব্বচনীয় হইয়াও ইন্দ্রিয়বোধ ও ভাবের সত্ত্ব লইয়াই যে মায়া প্রভুত্ব করিতেছে তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই তবে ইন্দ্রিয়বোধ ও ভাবের সত্ত্বগুলিও অনির্ব্বচনীয়ই বটে যাহাই হউক, ব্রহ্মসত্তা ব্যতিরেকে উহার স্বতন্ত্র সত্ত্ব নাই এইজন্য উহা স্বীকার করিলেও অদ্বৈতবাদে কোন বিরোধ আসিবার নহে। আর এইরূপ সত্ত্বায় বঞ্চিত হইয়াও যে উহা ইন্দ্রিয়বোধ ও ভাবের বাগান সাজাইয়া বসিয়াছে তাহা কম আশ্চর্য্যের বিষয় নহে মাকাল ফল যেমন স্বয়ং অসার হইয়াও রূপের মোহিনীশক্তিতে দর্শকের মন হরণ করে,

সেইরূপ মায়া স্বয়ং সত্তাশূন্য হইয়াও অনির্ব্বচনীয় জগৎরচনা নৈপুণ্যে লোকের মন মাতাইয়া ফেলিয়াছে

মায়াকে ব্যষ্টিরূপে অদৃশ্য হইতে দেখিলেও সমষ্টিরূপে তাহার বিলোপ ধারণা করিয়া উঠিতে পারা যায় না। কেননা যাহাতে কোন প্রকার মায়িক ঘটনা ঘটিতেছে না এইরূপ কাল প্রমাণ পথে আজ পর্য্যন্তও আসে নাই কাজেই মায়া সেইরূপ অনাদিকাল হইতে প্রবাহরূপে প্রবর্ত্তিত হইয়া আসিতেছে, সেইরূপ অনন্তকাল থাকিবে তবে প্রলয়কালে বিশ্বাসের কথা স্বতন্ত্র আর তত্ত্বজ্ঞান হইলে যে মায়া অন্তর্হিত হয় বলা হইয়াছে তাহার তাৎপর্য্য যাহাকে জ্ঞান আলিঙ্গন করে, তাহার পক্ষেই উহা তিরোহিত হইয়া থাকে কেনন জ্ঞানীর সমকালীন অজ্ঞানী দেখিতে পাই বলিয়া তাহার সর্ব্বাঙ্গীন তিরোধান অসম্ভব।

জীব

মায়াতে চিন্ময় ব্রহ্মের প্রতিবিম্বকে জীব বলা হইয়া থাকে অনন্ত শক্তির আধার মায়া মূল ও এক বলিয়া তাহাতে ঐ প্রতিবিম্বরূপ জীবও এক জাগ্রৎ ও স্বপ্ন অবস্থার পার্থক্য হেতু জীব এক হইয়াও ঐ অবস্থায় পৃথক্ পৃথক্ প্রতীয়মান হয় সুষুপ্তিতে জীবের একত্বই সাব্যস্ত হইয়া পড়ে এইজন্য

যে নিখিল জীবের সুষুপ্তি একই প্রকার নামের জাগ্রৎ ও স্বপ্ন অবস্থার শ্যামের ঐ অবস্থা হইতে পৃথক হইলেও উভয়ের সুষুপ্তি অবস্থা এক এই স্থলে এইরূপ আপত্তিরও অবসর রহিল না যে, ঐ অবস্থাতেও রাম এবং শ্যামের শরীর সম্পর্কিত পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায় কেন না ঐ পার্থক্যের দ্রষ্টা জাগ্রৎ অবস্থাপন্ন তৃতীয় ব্যক্তি। যখন সুষুপ্তি অবস্থার কোন ভিন্নতা অনুসন্ধানে পাওয়া যায় না, তখন ঐ অবস্থাপন্ন জীবকে পৃথক্ পৃথক্ স্বীকার করা কিছুতেই যুক্তি সঙ্গত হইতে পারে না পক্ষান্তরে জীবকে ব্রহ্ম প্রতিবিম্ব বলাতে ইহাও প্রতিপন্ন না হইয়া রহিল না যে, ব্রহ্মই জীবের সার অংশ, কেন না যুক্তিতে বিম্ব এই উপাধি সংযোগে প্রতিবিম্ব বলিয়া প্রতীয়মান হয়। তবে যাহারা বিম্ব হইতে স্বতন্ত্রভাবে অভিনব প্রতিবিম্বের উৎপত্তি মানিয়া লয় তাহাদের কথা স্বতন্ত্র।

এক জীববাদে শরীর ও অন্তঃকরণ প্রভৃতি পৃথক্ পৃথক্ উপাধি স্বীকৃত হইয়াছে বলিয়া বন্ধন মুক্তির ব্যবস্থাতেও বিশৃঙ্খল ঘটে না প্রকৃতপক্ষে একজীব অপর জীব সম্বন্ধে কিছুই খবর পায় না। সে যে সকল বিষয় বা ঘটনাকে অপরের মনে করে, সেই সমস্তই তাহার আপনার ইন্দ্রিয় বোধ বা মনোভাব। এইরূপ নীতিতে সমস্ত জগৎটাই জীবের আপনার ঐরূপ সম্পত্তি প্রতিপন্ন হইয়া পড়ে। অপরের বলিতে কিছুই নাই। যে চেষ্টা বা নিশ্বাসসঞ্চার দেখিয়া সে অপরের অস্তিত্বের অনুমান করিয়া লয় ঐ গুলিও তাহার নিজের সম্পত্তি

কাজেই অপরের অনুমান করিতে যাইয়া সে আপনারই অনুমান করিয়া ফেলে। তবে ইহা সত্য যে, জীব আপনার মত অপরকেও মনে করে অর্থাৎ নিজের পক্ষে চেষ্টা ও নিশ্বাস-সঞ্চার চেতনাশক্তি জনিত অনুভব করিয়া আপনার সাদৃশ্যে অপরের চেষ্টা ও নিশ্বাসসঞ্চারকেও সে স্বতন্ত্র চেতনাশক্তি-জনিত মনে করে এইরূপ মনে করাটাকে প্রমিতি বলিয়া গ্রহণ না করিতে পারিলেও ইহা যে জীবের স্বভাবে পরিণত হইয়া গিয়াছে তাহা অস্বীকার করিতে পারা যায় না আর সময়ে সময়ে যে লেখনী ও পুস্তককে চেতন মনে করিয়া আমরা নিক্ষেপ বা আঘাত করিয়া থাকি তাহার মূলেও ঐ ভ্রান্ত উপমিতি দেখিতে পাওয়া যায়

একই জীব যে কল্পনাবলে জীবের সৃষ্টি করিয়া লয়, তাহা স্বপ্ন অবস্থার পর্য্যালোচনা করিলে সুস্পষ্টরূপে বুঝিতে পারা যায় মানুষ স্বপ্নে যেরূপ লক্ষ লক্ষ সৈনিক সৃষ্টি করিয়া সমর বিজয়ী হয় সেইরূপ সহস্র সহস্র শ্রোতা রচনা করিয়া মঞ্চোপরি দাঁড়াইয়া অভিভাষণ দিতে থাকে এইরূপে জাগ্রৎ অবস্থায় অনেক জীব যে একই জীবের কল্পনা প্রসূত এই সত্য ও বিচারে নিবিষ্ট হইলে ব্যক্ত না হইয়া থাকে না এবং কল্পিত জীব যে প্রকৃত নহে ইহাও অনায়াসে হৃদয়ঙ্গম হইয়া পড়ে। কাযেই আর নানা জীববাদের লীলারসরঙ্গে সাজিয়া থাকিতে পারা যায় না পক্ষান্তরে নানা জীববাদে এক ব্রহ্মের অসংখ্য প্রতিবিম্ব এবং তাহার উপাধি না মানিলে চলে না। এইজন্য

যেরূপ গৌরব দোষের অভ্যুত্থান হয়, সেইরূপ নান চেতন স্বীকার করিবার জন্য অদ্বৈততত্ত্ব অসঙ্কুচিতভাবে থাকিতে পারে না

এক জীববাদে ব্যক্তিগত স্বতন্ত্র সুখ দুঃখ প্রভৃতির উপলব্ধি সম্বন্ধে ইহা বলা যাইতে পারে যে যেরূপ যোগী কায়ব্যূহ অবস্থাতে একই চেতন শক্তির দ্বারা লক্ষ লক্ষ শরীরে স্বতন্ত্র ভাবে ঐগুলির অনুভূতি সম্পাদন করেন, সেইরূপ একই জীব চৈতন্য হইতেও অসংখ্য ব্যক্তির সুখ দুঃখ প্রভৃতির স্বতন্ত্র ভাবে প্রতীয়মান হইতে কোন বাধা আসে না ত্তান এই মতে পৃথক পৃথক শরীর ও অন্তঃকরণাদি স্বীকার করা গিয়াছে বলিয়া এক ব্যক্তির সুখ দুঃখ অপর ব্যক্তির পক্ষে উপলব্ধ হইবার নহে।

জীব যখন ব্যাপক ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব, তখন তাহার অণু ও মধ্য পরিমাণ না বলিয়া বিভু পরিমাণ বলাই যুক্তি সঙ্গত। কেন না জীব চেতন এইজন্য জড় বস্তুর ধর্ম্ম অণু ও মধ্য পরিমাণ তাহার উপর আরোপ করাতে বিচার বৈপরীত্যেরই সূচনা হয় অণুপরিমাণের খণ্ডন ও ব্যাপক পরিমাণের সমর্থন ন্যায় দর্শনে অতি সমীচীন প্রণালীতে হইয়াছে, সুতরাং ইহা সংক্ষেপে বলা গেল

প্রকৃতপক্ষে জীব ব্রহ্ম হইয়াও মায়ার মোহিনী শক্তিতে আপনাকে ভুলিয়া গিয়াছে যে পর্য্যন্ত তাহার আমিই ব্রহ্ম এইরূপ তত্ত্বজ্ঞান না হয় সে পর্য্যন্ত আবর্ত্ত পতিত কীটের ন্যায় সে অনাত্ম বস্তুর গণ্ডীর মধ্যেই ঘুরিয়া বেড়ায়। এবং

এইজন্য পরিশ্রান্ত হইয়া এত ভগ্নোৎসাহ হইয়া পড়ে যে, তত্ত্বজ্ঞানের নাম শুনিবামাত্র শিহরিয়া উঠে। এইরূপ অবস্থাতে বেদান্তশাস্ত্রের অধ্যয়ন ও সৎসঙ্গ ব্যতীত কিছুতেই সে তত্ত্বজ্ঞানের দিকে যাইতে পারে না। সৎসঙ্গ ও ভক্তিনিবেশ সহকারে বেদান্তের অনুশীলন ক্রম নীতিতে মানুষকে অনাত্ম বস্তু হইতে আত্ম বস্তুর দিকে লইয়া আসে। কেবেই বিষয়াসক্ত ব্যক্তি উভয়ে ভীত না হইয়া থাকিতে পারে না এইজন্য যে, পাছে তাহার মনসাধের বিষয়কে উপেক্ষা করিয়া ফেলে। যাহাই হউক আমাদের লক্ষ্য জিজ্ঞাসু ব্যক্তি, অবশ্যই তিনি এইরূপ খেলা খেলিবেন না। কেন না তিনি জানেন "অবশ্যং যাতারশ্চিরতরং মুষিত্বাপি বিষয়া বিয়োগে কো ভেদস্ত্যজতি ন জনো যৎ স্বয়মমূন্। ব্রজন্তঃ স্বাতন্ত্র্যাদতুল পরিতাপায় মনসঃ স্বয়ং ত্যক্তাহ্যেতে শমসুখমনন্তং বিদধতি॥" বিশেষতঃ পামর ও বিষয়ী ব্রহ্মবিদ্যার অধিকারী নহে এইজন্য সৎসঙ্গ ও বেদান্তাধ্যয়ন করিয়াও তাহারা যে তিমিরে ছিল সেই তিমিরেই থাকে। বর্ত্তমান সময়ে প্রাচীনভাবের সামাজিক শাসন শিথিল হইয়া পড়িয়াছে বলিয়াই তাহারা এইরূপ কার্য্যে অকুণ্ঠিতভাবে যোগ দিয়া থাকে। যে শঙ্কর ব্রাহ্মণ ব্যতিরিক্ত দ্বিজাতিকে সন্ন্যাস আশ্রম হইতে দূরে রাখিয়া গিয়াছেন, আজ তাঁহার প্রবর্তিত গিরি পুরি উপাধি যুগি, কাহারও কৈবর্ত্ত পর্য্যন্ত ধারণ করিতেছে।

যদি কেহ প্রতিবিম্বকে জীব মানিতে কুণ্ঠিত হন, তবে তিনি মায়াবিশিষ্ট বা মায়োপহিত ব্রহ্মচৈতন্যকে জীব জানিয়া লইবেন। সমস্ত জীবের সার অংশ যে সাক্ষাৎ ব্রহ্ম ইহা কখন ভুলিবেন না। আর যদি দৈবযোগে ভুলিয়া যান, তথাপি বেদান্ত অবলোকন ও সাধুসঙ্গ হইতে বিরত হইবেন না। কেন না উভয়ে উদ্বোধক হইয়া তাঁহার ঐ স্মৃতি কোন না কোন সময়ে আনয়ন করিবে। যে প্রণালীতেই বিচার করা যায় পরব্রহ্ম যে জীবের আসল স্বরূপ এই সত্যের অপলাপ হয় না। আর ব্রহ্ম যদি জীবের মৌলিক অংশ না হইত, তবে কিছুতে মানুষ তাহার প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ করিতে পারিত না। কেননা আপন আত্মাকে বাদ দিয়া মানুষ অপর আত্মার যে সাক্ষাৎকার করিতে পারে, তাহার কোন উদাহরণ পাওয়া যায় না। তবে যাঁহারা যোগের দোহাই দিয়া নিরাকার পুরুষ বিশেষ ঈশ্বরকেও প্রত্যক্ষ গোচর বলিয়া মনে করেন, তাঁহাদের মধ্যে যিনি বুক ফুলাইয়া বলিতে পারেন যে আমি ঐ ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ করিয়াছি বা করিতেছি, এইরূপ ব্যক্তি অদ্যাপি চক্ষুর অতিথি হন নাই। তবে কথার পণ্ডিত অনেক পাওয়া যায়। পক্ষান্তরে আমি জীবের আসল স্বরূপ ব্রহ্মকে প্রত্যক্ষ করিতেছি এইরূপ যিনি অক্ষুণ্ণভাবে বলিতে পারেন এমন মহাপুরুষ শত শত রহিয়াছেন। কাযেই এইরূপ অবস্থাতে ভেদবাদীদিগের

উপ ■ দেবকে বেদান্তের অনুশীলনকারী বিরূপে হৃদয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবত বলিয়া জ নিতে পারে

ঈশ্বর।

যেরূপ মায়াতে ব্রহ্ম প্রতিবিম্বকে জীব বল হইয়াছে, সেইরূপ উহার বিম্বভাবাপন্ন অংশ ঈশ্বর বলিয় অভিহিত হইয়া থাকে জীবের ন্যায় ঈশ্বরও মায়িক, কিন্তু প্রতিবিম্ব হইতে বিম্বের মহিম অধিক। জীব ঈশ্বর মায়া অবচ্ছিন্ন হইলেও প্রতিবিম্ব ও বিম্বভাবে উভয়ের তারতম্য আছে এক চিৎস্বর ব্রহ্মই মায়ারূপ উপাধিযোগে বিম্বভাবাপন্ন হইয় ঈশ্বর এবং প্রতিবিম্বভাবে জীব বলিয় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন। এইরূপ প্রণালীতে বিম্ব ও প্রতিবিম্বভাবের তারতম্য থাকিলেও মায়া বিশিষ্ট ব্রহ্ম চৈতন্যই জীব ও ঈশ্বর উভয় সংজ্ঞার সংজ্ঞা অ র বিম্ব ও প্রতিবিম্বভাবের অস্তিত্ব উপাধির অবস্থিতির উপর নির্ভর করে কেননা মুখ দেখিবার সময়ে আয়নার অপসরণ করিলে ঐ ভাবের অভাব দেখিতে পাই

ব্রহ্ম চৈতন্যকে মায়ার সহিত মিশ্রিত করিলেই গুণ ঈশ্বর হইয়া উঠে। এই ঈশ্বর প্রকৃত পক্ষে মূল বস্তু না হইলেও ইহার উপাসনার প্রভাবে ঐ বস্তুর দিকে যাইবার যোগ্যত জন্মে পক্ষান্তরে এই ঈশ্বরের মায় ভাগ অসত্য হইলেও

ব্রহ্ম চৈতন্য অংশ সত্য কিন্তু অপবুদ্ধ ব্যক্তির উভয়কে যথার্থ মানিয় লয় ঈশ্বরে যে অযথার্থ বস্তুর সমাবেশ হইতে পারে ইহা তাহারা ধারণা করিয়া উঠিতে পারে না এই জন্যই তাঁহার নিত্যগুণ সমূহ আরোপিত হইতে দেখা যায় যাহাই হউক এই ঈশ্বর হইতে যে মহান্ ভাবের শিক্ষা কর যায় তাহাতে কোন সন্দেহ নাই

বিশ্ব সমষ্টিরই বিবরণ যে সগুণ ঈশ্বর তাহ বিচারে সাব্যস্ত হইয় যায় কেনন যাহা হইতে ব্যক্তি বিশেষ ঈশ্বরে অস্তিত্ব প্রতিপন্ন হয় এইরূপ অমোঘ যুক্তি আজ পর্য্যন্তও আবিষ্কৃত হইতে দেখা যায় ন তবে অন্ধ বিশ্বাসের কথা স্বতন্ত্র। আর অন্ধ বিশ্বাস যে আহার্য্য জ্ঞানেরই নামান্তর ইহাই ব কিপ্রকারে অস্বীকার করিতে পার যায় যাহাই হউক যুক্তিই বল এবং অন্ধ বিশ্বাসই বল, যদি কোন জিনিস মানুষকে ঈশ্বরের দিকে লইয়া যাইতে পারে; তবে লাভ ব্যতীত অলাভ হইবে ন মানুষ যে কোন প্রকারে পারে ঈশ্বরকে হৃদয়ের অধিষ্ঠাত দেবতা করিলে ধীরে ধীরে সে পশুভাবের সঙ্কোচ ও মনুষ্যত্বের বিকাশে কৃতকার্য্য হইবে কিন্তু ইহা ধ্রুব সত্য যে তত্ত্ব জ্ঞান লাভের যোগ্যত একমাত্র উক্ত সগুণ ঈশ্বরই আনিয় দিতে পারে এই বিষয়ে ব্যক্তি বিশেষ ঈশ্বরকে অন্যথ সিদ্ধ বলিলেও চলে

বর্ত্তমান সময়ে ঈশ্বর ন মান পাণ্ডিত্য ও উদারতা প্রভৃতির সূচক হইয়া পড়িয়াছে বিশেষতঃ নব্য শিক্ষিত সমাজের

অনেকেই আস্তিকতা অপেক্ষা নাস্তিকতাকে উৎকৃষ্ট বলিয়া জানেন ইহা যে অকারণ আকস্মিক ঘটনা তাহাও নহে ; কেনন আস্তিক সমাজের অনেকেই আস্তিকতাকে কুভাবে বিকৃত করিয়া তুলিয়াছেন। যে কোন ধার্ম্মিক সম্প্রদায়ে দেখা যায়, তাহাতেই প্রকৃত ধার্ম্মিকের সংখ্যা হইতে বক-ধার্ম্মিকের সংখ্যা অতি অধিক পরিমাণে বর্ত্তমান আর নিরক্ষর বা অশিক্ষিত লোকও ধার্ম্মিক সমাজে মিলিতে পারে ; কিন্তু এইরূপ লোকের পক্ষে যুক্তি তর্ক দ্বারা ঈশ্বর খণ্ডন অত্যন্ত কঠিন বলিয়া ইহারা নাস্তিক সমাজে কমই যোগ দেয়। তবে ইহা সত্য যে যেরূপ সকল নাস্তিকই কৃতবিদ্য নহে, সেইরূপ তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই বিলাসিতাকে জীবনের প্রধান লক্ষ্য করিয়া বসিয়াছেন বিশেষতঃ খ্যাবিষ্টান সম্প্রদায়ে এই ভাবটা গজাইয়া উঠিয়াছে

নাস্তিক-সম্প্রদায় যুক্তি তর্কের অস্ত্র শস্ত্র লইয়া যতই কেন সংগ্রামে প্রবৃত্ত হউন না, ব্যক্তি বিশেষ ঈশ্বর তাঁহাদের ঐ অস্ত্র শস্ত্রের আঘাত সহ্য না করিতে পারিলেও অদ্বৈত-বাদের স্বপ্রকাশ জ্ঞানরূপ-ব্রহ্মের বজ্রসার অস্ত্রে ঐগুলি চূর্ণ বিচূর্ণ না হইয়া থাকিবে না কেনন অদ্বৈতবাদ অবাট্য যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত একমাত্র ইহাই নহে, কিন্তু প্রত্যক্ষ জ্ঞান মূলক। পক্ষান্তরে ইহাও নাস্তিকদিগের বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত যে ইন্দ্রিয় সংযম ও বিষয়োপরামে সুদীক্ষিত না হইতে পারিলে কিছুতেই মানুষ অন্তর্মুখ হইতে পারে না, এবং অন্তর্মুখতায়

অভাবে ততুপরতার পরব্রহ্মের গ্রহণোপযোগিনী স্বতন্ত্র প্রজ্ঞার উদ্ভব হয় না। পরন্তু নাস্তিক সমাজে উদারতা ও লোক-হিতৈষণা থাকিলেও সংযতেন্দ্রিয় ও বিষয়োপরত ব্যক্তি কমই দেখিতে পাওয়া যায়। তবে জৈনী ও বৌদ্ধদিগের কথা স্বতন্ত্র।

ব্যক্তি বিশেষ ঈশ্বরবাদ হইতে এই শিক্ষা পাওয়া যায় না যে প্রত্যেক বস্তুই ঈশ্বরের অংশ। এই মতের ঈশ্বর যেন মেঘমালার অন্তরালে থাকিয়া জগতের শাসন করিতেছেন। সুতরাং প্রত্যেক জিনিসের সার অংশই পরব্রহ্ম এই প্রকৃত তত্ত্বকে এই মত হইতে বুঝিয়া লওয়া অত্যন্ত কঠিন। এইজন্যই অদ্বৈতবাদে এইরূপ ঈশ্বরের বিশিষ্টভাবে মহিমা কীর্ত্তিত হয় নাই। তবে ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে, ঈশ্বর না মানা অপেক্ষা ব্যক্তি বিশেষ ঈশ্বর মানাও ভাল। আর যাহাদের মস্তিষ্ক সূক্ষ্ম বিষয় গ্রহণ করিতে অসমর্থ বা সহজেই ক্লান্ত হইয়া পড়ে, তাহাদের পক্ষে এই ঈশ্বরই উপযোগী। কেনন একমাত্র বিশ্বাস বলেই ইঁহাকে লাভ করিতে পারা যায় বলিয়া এই সম্বন্ধে যুক্তি তর্ক লইয়া মাথা ঘামাইবার আবশ্যকতা নাই।

লোক সর্ব্বাত্মক ঈশ্বর বা ব্যক্তি বিশেষ ঈশ্বর মানুক, যে পর্য্যন্ত অন্তঃকরণ বিশুদ্ধ হয় না, সে পর্য্যন্ত উহার ফলে তাহাকে বঞ্চিতই থাকিতে হয়। এইজন্য উপাসক মাত্রের পক্ষে ইহার প্রতি সবিশেষ লক্ষ্য রাখা উচিত। যাহারা প্রতিদিন চারি ঘণ্টা উপাসনা করিয়াও আজীবন সংসারের অবৈধ

ব্যাপার লইয়া ব্যস্ত থাকে, তাহাদের উপাসনা যে অঙ্গহীন বিপর্য্যস্ত উপাসনা নহে এই বিষয়ে কোন প্রমাণ নাই। আর অনেকেই যে ঈশ্বরের উপাসনা করিতে যাইয়া কোন না কোন পার্থিব বিষয়ের উপাসনা করিয়া ফেলেন তাহারও অনেক উদাহরণ পাওয়া যায়। কাজেই যাহাতে উপাস্য বস্তুতে মন লাগিয়া থাকে, তাহার জন্য সর্ব্বদা সতর্ক থাকা আবশ্যক। চিত্তকে একাগ্র অবস্থাতে না আনিতে পারিলে চিত্তের বিষয়াকার পরিণাম কিছুতেই মিটিবার নহে। প্রাণায়াম ও অনাহত ধ্বনি শ্রবণ ক্রমনীতিতে একাগ্র অবস্থায় উপনীত করে।

সগুণ সর্ব্বাত্মক ঈশ্বর মানিক হইলেও তাঁহাকে যথাযথরূপে বিশ্বাস করিতে পারিলে বিষময় সংসার অমৃতময় হইয়া উঠে। কেননা এইরূপে বিশ্বাসকারীর অনুভব হইয়া থাকে যে, "ত্বং স্ত্রী ত্বং পুমানসি ত্বং কুমার উতবা কুমারী ত্বং জীর্ণোদণ্ডেন বঞ্চসি ত্বং ত্বং জাতো ভবসি বিশ্বতো মুখ"। গৃহস্থের পক্ষে এইরূপ ভাব পরম হিত লইয়া আসে, কেননা প্রত্যেক বস্তুতে ঈশ্বর-ভাব সুদৃঢ় হইলে তাহার পক্ষে ঘৃণা বা বিদ্বেষের জিনিষ কিছুই থাকে না। যে দিকে তাহার দৃষ্টি পড়ে সেই দিকেই সে উপাস্য দেবকে দেখিতে পায়। এইরূপে নিখিল বস্তুতে ঈশ্বরভাব যত বাড়িবে, ততই সে মূল বস্তুর দিকে অগ্রসর হইতে থাকিবে। পরিশেষে বিচারের প্রভাবে সকল জিনিষের আসল স্বরূপ পরব্রহ্মকে প্রত্যক্ষ ও উপলব্ধি করিতে পারিবে। ইহাই জীবের পরম পুরুষার্থ বা অন্তিম উন্নতি।

সুতরাং সর্ব্বাত্মক ঈশ্বরের ভাব ব্যক্তি বিশেষ ঈশ্বরেও আরোপিত হইতে দেখা যায় শিব, শক্তি ও বিষ্ণুর ঐ ভাব শিবপুরাণ, চণ্ডী ও গীতাতে বর্ণিত হইয়াছে কাজেই শৈব, শাক্ত ও বৈষ্ণব যে একই ঈশ্বরভাবের উপাসক এই সত্য ব্যক্ত হইয়া পড়িল তাঁহাদের উপাস্য দেবতাগুলি ব্যক্তিগত-ভাবে বিভিন্ন হইলেও এক ঈশ্বরভাবে তাঁহাদিগকে উপনীত করে কিন্তু ঈশ্বরভাব ভুলিয়া কেবল ব্যক্তিগত ভাবের গোঁড়া হইলে যেরূপ তত্ত্ব-জ্ঞানের দিকে যাইতে পারা যায় না, সেইরূপ সাম্প্রদায়িকতার বিসম্বাদও মিটিবার নহে। আর এই বিসম্বাদ থাকিতে মানুষের কি সাধ্য যে, সে আপনার উপমায় নিখিল মনুষ্যকে দেখিতে পারে তবে ইহা সত্য যে, আপন সম্প্রদায়ের কোন না কোন হিত সাধন তাহা হইতে অবশ্যই হয় যদি এই হিত সাধনও ব্যবহিতভাবে সাধারণ অভ্যুদয়ে পরিণত হইতে পারে, তথাপি ইহা তদুদ্দেশে অনুষ্ঠিত নহে এইজন্য একাধিক অন্তরায় যে মধ্যবর্ত্তী হইবে না, তাহাকে নিশ্চয়সহকারে বলিতে সক্ষম ? এইরূপে কার্য্যের বৈধাবৈধভাব উদ্দেশ্যের উপরে নির্ভর করিতেছে প্রথমে উদ্দেশ্য শুদ্ধি, পরে কার্য্যের সাধন ও স্বরূপের সংশোধন

গুণাতীত ব্রহ্ম।

নির্ব্বিকল্প সমাধিতে নিখিল মনোবৃত্তির নিরোধ হইলে একমাত্র গুণাতীত ব্রহ্ম সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত হইয় পড়েন যদি ব্যুত্থান অবস্থাতেও তাঁহাকে গুণ স্পর্শ করিতে পারে না, তথাপি ঐ অবস্থাতে মনোবৃত্তির প্রবাহ চলিতে থাকে বলিয়া ঐ বৃত্তির সহিত তাহার সাক্ষিরূপে তিনি প্রতিভাত হন কাযেই বৃত্তি ও গুণেরই অন্তঃপাতী এইজন্য গুণ যোগ পথ্য ব্যুত্থান অবস্থাতে তাহার তিরোহিত হয় না তথাপি তাঁহার নিগুর্ণ অসঙ্গ স্বরূপ যে নিষ্কলঙ্কই থাকে এই সত্য তত্ত্বজ্ঞানের মহিমায় বুঝিতে পারা যায় কেননা অবিরাম গুণের ধারা চলিতেছে, কোন ধারাই স্থিতিশীল নহে, তথাপি ঐ ধারা গুলির প্রকাশরূপ জ্ঞান একভাবে অখণ্ডরূপে সর্ব্বদা বর্ত্তমান রহিয়াছে গুণ বিবিধ রূপ ধারণ করিয়া উঠিতেছে ও তৎক্ষণাৎ বিলীন হইয় যাইতেছে, কিন্তু জ্ঞান একই প্রকাশরূপে প্রত্যেক গুণে অনুস্যূত হইয়া আপন অবিনাশিত্বের পরিচয় দিতেছে। ফলকথা গুণের সহিত জ্ঞান যেরূপ মিশিতেছে না, সেইরূপ তাহার পরিবর্ত্তনে পরিবর্ত্তিতও হইতেছে না। এইরূপ প্রণালীতে বুঝিতে পারা গেল যে, ব্যুত্থান অবস্থাতে নিগুর্ণ বলা যায় এইজন্য যে গুণের সহিত তিনি নির্লিপ্তভাবে থাকেন এবং গুণের পরিণাম উপাদান নহেন

নির্ব্বিকল্প সমাধি ব্যতীত নির্গুণ ব্রহ্ম নির্দ্ধারণে প্রকাশিত হয় না। এইজন্য যাহারা অসমাহিত বা সমাধির অস্তিত্বে সন্দিহান, তাহারা ঐ ব্রহ্মকে হৃদয়ে স্থান দেয় না। ইহাতে যে তাহাদের সবিশেষ দোষ আছে তাহা নহে, কেননা তাহারা বহির্মুখতা ও বিক্ষিপ্ততার ক্রীড়া-কু-রঙ্গে পরিণত হইয়া পড়িয়াছে বলিয়া কোন ক্রমে অন্তর্মুখ হইতে পারিতেছে না। আর অন্তর্মুখ না হইতে পারিলে ঐ ব্রহ্ম মানব বুদ্ধির অগম্যই থাকিয়া যায়। এমন কি অনেক দার্শনিকও অন্তর্মুখতার অভাবে নির্গুণ ব্রহ্মকে বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই। কাজেই অন্তর্মুখতাকে ব্রহ্ম-দর্শনের অবশ্যম্ভাবী কারণ পরম্পরার অন্তঃপাতী না বলিলে চলে না। কিন্তু ইদানীন্তন সময়ে কেবল বুদ্ধি বৈশারদ্যে জন্য মূলবস্তুকে ধরিতে যাইয়া অনেকেই শূন্যহস্তে ফিরিয়া আসেন।

যখন গুণের পরিণাম উপাদান মায়া, এইজন্য গুণের পরিবর্ত্তনে কেবল উহার পরিবর্ত্তন ঘটে, তখন এই ব্যাপারে ব্রহ্মকে কেবল অধিষ্ঠান বলাই উচিত। অর্থাৎ ব্রহ্মের অবলম্বনে মায়া বিবিধ প্রকারে গুণের বেশ ধারণ করিয়া অজ্ঞানীর মন বিমোহিত করিতেছে। ইহা মায়ার কম বাহাদুরী নহে যে, নির্গুণ ব্রহ্মকেও সগুণ বলিয়া বুঝাইয়া দেয়। কিন্তু তত্ত্বদর্শীর নিকটে তাহার সকল চাতুরীই ব্যক্ত হইয়া পড়ে। তিনি বুঝিতে পারেন যে হতভাগিনী মায়াই গুণের মোহন বেশ ধারণ করিয়া অতত্ত্ব-জ্ঞানীদিগকে কুপথে চালাইয়া থাকে। এইরূপ প্রণালীতে

বিবেকীর বিচারের এগ্ন যেরূপ নির্গুণ সাব্যস্ত হয়, তদ্রূপ ক্রিয়া জড়ের অসাধারণ ধর্ম্ম বলিয়া উহা যে নিষ্ক্রিয় ইহাও প্রতিপন্ন হইয়া পড়ে কাযেই গুণ ও ক্রিয়ার বাজারে দোকানদারেরা যে এইরূপ ব্রহ্মের নাম শুনিবামাত্র শিহরিয়া উঠিবে তাহাতে আশ্চর্য্য কি? যখন ব্রহ্ম নির্গুণ ও নিষ্ক্রিয় সাব্যস্ত হইল, তখন তাহাকে অসঙ্গ বা নির্লেপ বলিতে হয় এইজন্য যে সসঙ্গ ও লিপ্তভাব সগুণ ও সক্রিয় বস্তুতেই দেখিতে পাওয়া যায়

জগতে গুণ ও ক্রিয়ার বড়ই সমাদর যে ব্যক্তির গুণ নাই এবং যে কিছু করে না, উভয়েই নিন্দিত না হইয়া থাকিতে পারে না এমন কি আত্মীয় স্বজনের নিকটেও ঐ ব্যক্তি যুগলকে লাঞ্ছিত হইতে হয় এইরূপ অবস্থাতে প্রস্তাবিত ব্রহ্ম যে পৃথিবীতে আদরের জিনিষ বলিয়া পরিগণিত হইবে এইরূপ আশা না করিতে পারিলেও যাঁহারা সত্য বস্তুর অনুসন্ধানে রত, তাঁহারা অবশ্যই ইহাকে হৃদয়ে রাখিবেন কেননা নির্গুণ ও নিষ্ক্রিয় ভাবই সত্য-বস্তুর অব্যভিচারী লক্ষণ পক্ষান্তরে গুণ ক্রিয়ার অতীত পরব্রহ্ম সত্তাতাদাত্ম্যশালী অনন্য ভিন্ন স্বপ্রকাশ জ্ঞান ব্যতীত অপর জিনিষ নহে এইজন্য বিচারশীল ব্যক্তির মন উহার প্রতি আকৃষ্ট না হইয়া থাকে না। সৌন্দর্য্য জ্ঞানের দিক দিয়া দেখিলেও ইহা হইতে অধিক সুন্দর বস্তু কোথায়ও খুজিয়া পাওয়া যায় না তবে যাঁহারা কেবল জড় বস্তুর গঠন প্রণালীতে সৌন্দর্য্য দেখেন, তাঁহাদের পক্ষে ইহা অসুন্দরই বটে কিন্তু ইহাতে কিছু আসে যায় না, এইজন্য

যে, তাঁহারা আধ্যাত্মিক জীবন লাভেই বঞ্চিত হইয়া রহিয়াছেন আর এইরূপ জীবন লাভ না করিতে পারিলে যে ব্রহ্ম-সৌন্দর্য্য অনুভব করিতে পারা যায়, তাহার কোন নিদর্শন নাই অন্তর্মুখ জ্ঞানী নির্জনে বসিয়া অনাহত ধ্বনির সাক্ষী ঐ স্বপ্রকাশ ব্রহ্মের যে সৌন্দর্য্য অনুভব করেন, তাহা জড়ের পরিণাম আকৃতি স রূপে কোথায়? তবে বালকের পক্ষে খেলনার সৌন্দর্য্যে আত্মহারা হইয়া যাওয়া একটা আশ্চর্য্যজনক ঘটনা নহে

ব্রহ্মের অদ্বৈতভাব

ব্রহ্মসত্তাই মায়া ও মায়িক বস্তুর সত্তা এইজন্য উভয়ের স্বতন্ত্র সত্তা নাই। কাযেই মায়া ও মায়িক বস্তু নানাতেও পরব্রহ্মের বিজাতীয় ভেদ প্রতিপন্ন হইবার নহে এইরূপে ব্রহ্মের সমকক্ষ অপর কোন নিত্য সত্য বস্তু নাই বলিয়া যেরূপ তাঁহার সজাতীয়ভেদ সিদ্ধ হইতেছে না, সেইরূপ অখণ্ড ও নিরবয়ব হওয়াতে তাহার স্বগত ভেদও সুদূর পরাহত স্বগত ভেদের অর্থ অবয়ব সম্পর্কিত ভিন্নতা। এইরূপ তিন প্রকার ভিন্নভাব না থাকারই নাম অদ্বৈতভাব বস্তু স্বগত ভেদ যে ব্রহ্মের নাই ইহা যেরূপ সহজে বুঝিতে পারা যায়,

তদ্রূপ তাহার স্বজাতী ও বিজাতীয় ভেদশূন্যতা অনায়াসে হৃদয়ঙ্গম হইবার নহে কেননা মানুষ মায়িক বস্তু প্রত্যক্ষসিদ্ধ দেখিয়া তাহার অজ্ঞাত সত্তার প্রত্যয়াশ্রিত একমাত্র ইহাই নহে, কিন্তু অনেক নিত্য আত্মার অস্তিত্বকেও হৃদয়ের স্থায়ীসম্পত্তি করিয়া লইয়াছে এইরূপ অবস্থাতে যুক্তি তর্কের সাহায্যে মনের কুসংস্কার বিদূরিত করিতে হইবে। জগৎপ্রত্যক্ষ সিদ্ধ বটে, কিন্তু আমরা কি তাহার অজ্ঞাত সত্তা সম্বন্ধে কোন খবর পাই? কেবল তুল্যভাবে বস্তুজ্ঞানের পুনরাবৃত্তি দেখিয়া অন্ধ পরম্পরাক্রমে ঐরূপ সত্তা মানিয়া লই অনেক নিত্য আত্ম সম্বন্ধেও কেবল কল্পনারই দুর্দ্দশা দেখিতে পাই, এই সম্বন্ধে পুর্ব্বে আলোচনা করা গিয়াছে বলিয়া সংক্ষেপে বলা গেল

অদ্বৈতবাদ যে যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, ইহাকে সর্ব্বতন্ত্র সিদ্ধান্ত বলিলেও অন্যায় হইবে না। বিশেষতঃ যাঁহারা শঙ্করভাষ্য পড়িয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে, শঙ্করের যুক্তি নিরাকরণের ভয় অতিক্রম করিয়াছে অধিকন্তু অদ্বৈতবাদ যে প্রত্যক্ষ অনুভূতির উপর প্রতিষ্ঠিত, এই সত্য তত্ত্বদর্শীর নিকটে ব্যক্ত হইয়া থাকে তিনি অনুভব করেন 'একমেবা' দ্বিতীয়ং' 'নেহ নানাস্তি কিঞ্চন' এই বিষয়ে এইমাত্র বলিলেই উপযুক্ত হইবে যে, যাঁহারা এইরূপ অনুভবে সন্দিহান তাঁহারা তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে চেষ্টা করুন, উহা লব্ধ হইলেই তাঁহাদের সন্দেহ স্বয়ং অদৃশ্য হইয়া পড়িবে, এবং অভিনব অপূর্ব্ব অনুভব আসিয়া উপস্থিত হইবে যে, "ব্রহ্মৈবেদ মমৃতং

পুরস্তাদ্ব্রহ্ম পশ্চাদ্ব্রহ্ম দক্ষিণতশ্চোত্তরেণ ব্রহ্মৈবেদং বিশ্বমিদং বরিষ্ঠং”

স্বতন্ত্র সত্তাশূন্য মায়া ও মায়িক বস্তু প্রতীয়মান হয় বলিয়াই ব্রহ্মের মহত্ত্ব আমরা বুঝিতে পারি, যেমন অন্ধকার না থাকিলে জগতে বৈদ্যুতিক আলোকের সমাদর হইত না। যে কোন মায়িক বস্তুসম্বন্ধে বিচার করিতে বসি, তাহাই সত্ত্বহীন অসার হইয়া দাঁড়ায়। গুণের স্তরগুলির বিশ্লেষণ ব্যাপার নিঃশেষ হইলেই উজ্জ্বল ব্রহ্মসত্তা আসিয়া সম্মুখে খাড়া হয়। এই সত্তার ব্যতিক্রমে নৈসর্গিক কোন জিনিসই দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহা সর্ব্বব্যাপী এইজন্য যে ইহাকে বাদ দিয়া কোন বস্তুরই অপর আসল স্বরূপ খুঁজিয়া বাহির করিতে পারা যায় না। তথাপি মায়িক বস্তুকে সর্ব্বথা বিদায় করিয়া দেওয়া সহজ ব্যাপার নহে। কেননা মনের লয় না হওয়া পর্য্যন্ত ইহা প্রতীতি গোচর হইয়া থাকে। তবে মিথ্যাত্ব নিশ্চয়রূপ বাধ আসিয়া উপস্থিত হয়। এই বাধের প্রভাবে অজ্ঞানীর ন্যায় মায়িক বস্তু অনুভব করিয়াও জ্ঞানী তাহাতে অনাসক্ত থাকেন।

মায়া বা হীরক স্বর্ণ প্রভৃতি মায়িক জিনিসগুলি যদি ব্রহ্মের ন্যায় সত্য হইত, তবে অবশ্যই অদ্বৈতবাদের নির্যুক্তিকত্ব প্রতিপন্ন না হইয়া থাকিত না। কিন্তু যখন ব্রহ্মসত্তা ব্যতিরেকে ঐগুলির কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায় না, তখন অদ্বৈতবাদকে অসত্য জিনিসে পরিণত করিতে পারা যায় কৈ ?

এইরূপে জীব ব্রহ্মাতিরিক্ত স্বতন্ত্র নিত্য বস্তু বলিয়া সিদ্ধ হইলে সজাতীয় ভেদের উত্থানে অদ্বৈতবাদের অঙ্গ ক্ষত বিক্ষত হইয়া পড়িত। ইহা যেরূপ সত্য, সেইরূপ ব্রহ্ম যদি সাবয়ব বস্তু বলিয়া নিরূপিত হইত, তবে স্বগতভেদের আবির্ভাবে উহা কিছুতেই অক্ষত শরীরে থাকিতে পারিত না। পরন্তু এই তিনপ্রকার ভেদভাবের মধ্যে কোন ভেদভাবের সমাবেশ হইতেছে না বলিয়া অদ্বৈতবাদ যে সত্য এই বিষয়ে কোন বিসম্বাদ রহিল না।

ব্রহ্মানুভূতির সহজ উপায়

ব্রহ্মানুভব সম্বন্ধে যে বিবিধ প্রকারের সাধন শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, ঐ সকলগুলিই বিলম্বে বা অবিলম্বে মানুষকে সাধ্য বস্তুর দিকে লইয়া যায়। কিন্তু সহজে ব্রহ্মানুভব হইতে পারে বলিয়া বক্ষ্যমাণ সাধনকে আমরা পাঠকের সম্মুখে উপস্থিত করিতেছি। অন্তর্জ্জগতে নিত্যবস্তুর নির্ব্বাচন করিয়া লওয়াই ব্রহ্মানুভূতির সহজ সাধন। সুখ দুঃখ প্রভৃতি ভাব গুলির মধ্যে কোন্ ভাবটা সর্ব্বদা বর্ত্তমান থাকে, প্রথমে ইহা বুঝিয়া লইলে অপর জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি বুঝিবার জন্য সবিশেষ প্রয়াস করিতে হয় না। জ্ঞানকে বাদ দিয়া অন্তর্জ্জগতের এমন কোন জিনিস অনুভবে আসে না, যাহা ক্ষণভঙ্গুর নহে সুতরাং নিত্য

সুখ নাশ আর দুঃখ প্রভৃতি নাশ, সকলেই ক্ষণবিনাশিত্বের কবলে পতিত। এই গুলির মধ্যে কোনটাই অপরভাবের যৌগপদ্য লাভ করিতে পারে না। এইজন্য যে একভাবের তিরোভাব না হইলে অপরভাবের আবির্ভাবই অসম্ভব হইয়া উঠে। যখন সুখ আছে তখন দুঃখ নাই এবং যখন দুঃখ আছে তখন সুখ নাই। একের ভাবে যেরূপ অপরের অভাব, সেইরূপ একের অভাবে অপরের ভাব। এইরূপে যদিও ভাবাভাবের যৌগপদ্য প্রতিপন্ন হয়, তথাপি ভাবদ্বয়ের অযৌগপদ্যই থাকিয়া যায়। আর এই অযৌগপদ্যের দিক্ দিয়া দেখিলে অন্তর্জগৎটা যেরূপ মহা শ্মশানে পরিণত হইয়া পড়ে, সেরূপ বৃহৎ সূতিকালয়ের স্মৃতি লইয়া আসে। অর্থাৎ ইহাতে উৎপত্তির পরক্ষণেই ভাবরাশির বিনাশ ঘটিতেছে। এইরূপ প্রণালীতে জ্ঞান ব্যতিরিক্ত নিখিল ভাবের অস্থায়িত্ব নিশ্চয় করিয়া লইলে স্থায়িত্বের দিকে মনঃসংযোগ করিতে হইবে। মনে কর ক্রমনীতিতে সুখ, দুঃখ ও ইচ্ছা উৎপন্ন হইবামাত্র বিনষ্ট হইয়া গেল। কিন্তু জ্ঞান স্থায়িভাবে তিন ঘটনাতে বিদ্যমান, কেনন যেরূপ সুখের সময়ে জ্ঞান রহিয়াছে, সেইরূপ দুঃখ ও ইচ্ছার সময়েও উহ বর্ত্তমান। এইরূপে ইচ্ছার পরবর্ত্তী ভাব সমূহের প্রতিও এক এক করিয়া ভাবিয়া দেখিলেও ঐ ভাবগুলির অস্থায়িত্ব ও জ্ঞানের স্থায়িত্ব প্রতিপন্ন হইয়া যায়। এমন কি কল্প পর্য্যন্ত সময়ের ভাবপুঞ্জ ও জ্ঞানের বিষয় ভাবিয়া দেখিলেও জ্ঞান স্থায়ী ও ঐগুলি অস্থায়ী বলিয়া সিদ্ধ হয়।

যখন এইরূপ সময় অনুসন্ধানে পাওয়া যায় না যাহাতে জ্ঞানের অভাব ধরিয়া লইতে পারা যায়, তখন বাধ্য হইয়া জ্ঞানকে নিত্য বলিতে হয়। ধারাবাহিকরূপে এই প্রণালীর বিচার করিতে থাকিলে পরিশেষে নিত্য বস্তু নির্ব্বাচিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই তত্ত্বজ্ঞান লাভের পূর্ব্বভাবী লোকোত্তর শান্তি আসিয়া উপস্থিত হয়। ইহা প্রবুদ্ধ অবস্থার পথ হইলেও প্রবুদ্ধ অবস্থাতে মানুষকে উপনীত করে।

নিত্যবস্তু নির্ব্বাচিত হইবার পরে, উহা যে সর্ব্বানুস্যূত, প্রত্যেক ঘটনার আশ্রয় ও উহার প্রকাশক ইহা স্বতই ব্যক্ত হইয়া পড়ে। এইরূপ অবস্থাতে পূর্ব্বাভিহিত যুক্তির সাহায্যে ঐ নিত্যবস্তুকে স্বয়ং প্রকাশ বলিয়া বুঝিয়া লইতে হইবে। কেন না যাহা অপরের দ্বারা প্রকাশিত, তাহার নিত্যতা প্রমাণিত হওয়া অসম্ভব এইজন্য যে, এইরূপ বস্তু পরিবর্ত্তনের স্রোতে অঙ্গ ঢালিয়া দিয়াছে। এইরূপে বুঝিতে বাকি রহিল না যে, আমাদের নিত্যবস্তু সর্ব্বানুস্যূত, সর্ব্বাশ্রয় ও সর্ব্বপ্রকাশক হইয়া স্বয়ং প্রকাশ। কাযেই ইহা ব্যতিরেকে যখন অন্তর্জগতে এইরূপ গুণ সম্পন্ন অপর জিনিষ দেখিতে পাওয়া যায় না, তখন জ্ঞান সুখ দুঃখ প্রভৃতির আধার রূপে একটা কিম্ভূত কিমাকার নিত্যবস্তু বলপূর্ব্বক মানিয়া লইলে কোন প্রকারে বিচার বৈশারদ্যের পরিচায়ক বলিতে পারা যায় না। আর আমার সুখ আমার দুঃখ প্রভৃতি প্রতীতি গুলির বিশ্লেষণে সুখ দুঃখও তাহাদের প্রকাশক জ্ঞান ব্যতীত আমি বলিয়া

অপর কোন জিনিস পাওয়া যায় না এইজন্য হয় হইতে জ্ঞান ও সুখ দুঃখ ছাড়া একটা স্বতন্ত্র আত্মা প্রতিপন্ন হইবে নাহে কাজেই এই প্রতীতি গুলি সম্বন্ধে বলিতে হইবে যে, জ্ঞানে আমির উপচার হয়, কেন না বাস্তব মস্তক এই প্রতীতিতে মস্তকে রাহুর উপচার দেখা যায়

প্রকৃত পক্ষে আমার সুখ আমার দুঃখ প্রভৃতি প্রতীতি দেহাত্ম ভ্রান্তিমূলক অতএব উক্ত জ্ঞানরূপ নিত্য বস্তুই আত্মা, এইজন্য যে অপর জিনিসকে আত্মা বলিলে উহা অনিত্যে পরিণত না হইয়া থাকে না

এইরূপে এই অন্তরতম জ্ঞানের সহিত নির্লেপ, অসঙ্গ ও অপর নির্গুণ ভাব সামঞ্জস্য করিয়া লইলে উহা ব্রহ্মে পরিণত হইয়া পড়ে। আত্মভাবে বা ব্রহ্মভাবে দেখা যাউক্ ঐ জ্ঞানই যে উভয় পদের বাচ্য ইহাতে কোন সন্দেহ নাই কেননা ঐরূপ নিত্যবস্তু এক বলিয়া অসংখ্য নিত্যবস্তুকে আত্মসংজ্ঞান সংজ্ঞা করা এবং কোন বিশিষ্ট নিত্যবস্তুকে ব্রহ্ম বলা যুক্তিযুক্ত নহে আর নিত্য বস্তুকে স্বয়ং প্রকাশ বলাতেই জড় প্রকৃতি যে ঐ বস্তু নহে ইহা বেশ বুঝিতে পারা গেল, এইজন্য যে চন্দ্র সূর্য্য প্রভৃতি জ্যোতিষ্মান্ জড় ও জ্ঞানেই প্রতিভাসিত হইতে দেখা যায়।

যখন ব্রহ্ম ও আত্মা একই জিনিস সিদ্ধ হইল, তখন এই আত্মাই ব্রহ্ম এইরূপ জ্ঞানকে তত্ত্বজ্ঞান বলিতে কোন বাধা রহিল না তত্ত্বজ্ঞানের কারণ রূপ মহাবাক্য বিভিন্ন হইলেও

উহা ও উপাধি একই বস্তু অপ্রবুদ্ধ ব্যক্তির দেহ ও মনোভাব সমষ্টিতে আত্মভ্রান্তি থাকে বলিয়া তাহাকে লক্ষ্য করিয়া 'তুমিই ব্রহ্ম' 'আমিই ব্রহ্ম' এইরূপ মহাবাক্যের প্রবর্তন করা হইয়াছে। যখন গুরু মুখে মহাবাক্য শ্রবণ করিলে এইরূপ ব্যক্তির তত্ত্বজ্ঞানের লব্ধ হইয়া যায়, তখন ইহার কোন আবশ্যকতা থাকে না এইজন্য যে অন্তর্মুখ হইবামাত্র জ্ঞানী ব্রহ্মানুভূতি সুখে মগ্ন হইয়া যান। সুতরাং এক অখণ্ড নির্বিকার ব্রহ্মই যখন আত্মশব্দের প্রবৃত্তি নিমিত্ত, তখন আমি তুমি প্রভৃতি ভিন্নভাব সূচক পদ বিন্যাসের অবকাশ কোথায় থাকে? এই পদবিন্যাসের জঞ্জাল মিটাইবার উদ্দেশে অনেক জ্ঞানী মহাপুরুষ মৌনাবলম্বন পূর্ব্বক আপনার অন্তর্মুখত বাড়াইতে থাকেন, এইজন্য যে উহা অন্তিম সীমায় পৌঁছিলেই সমাধি আর এই অবস্থাতে ব্রহ্মরূপে পরিণত বৃত্তি ব্যতীত অপর কোন জিনিষেরই প্রতীতি হয় না ব্রহ্ম স্বয়ং প্রকাশ জ্ঞানরূপ হইলেও তাহাকে বুঝিয়া লইতে কেবল তদাকার বৃত্তির আবশ্যকতা আছে, কেনন অপ্রবুদ্ধ অবস্থাতে এইরূপ বৃত্তির অভাবে অজ্ঞানীর নিকটে উহা অনধিগম্যই থাকে এই বৃত্তি অভাসন-পাদক আবরণকে ভাঙ্গিয়া ফেলিবামাত্র জ্ঞান আপন স্বপ্রকাশ-ত্বের মহিমায় সূর্য্যের ন্যায় প্রকাশিত হইয়া পড়ে যদিও কোন কোন অপ্রবুদ্ধ ব্যক্তিকেও বেদান্ত বা অপর দর্শন-শাস্ত্রের আলোচনায় স্বয়ং প্রকাশ নিত্যজ্ঞানের আস্তিত্বে প্রত্যয়ান্বিত হইতে দেখা যায়, তথাপি যিনি হস্তামলকের ন্যায় অপরোক্ষ

ভাবে জ্ঞানকে ধরিয়া লইয়াছেন এইরূপ ব্যক্তি অপ্রবুদ্ধ সমাজে বিরল। যাহাই হউক, সজ্ঞান পথে উত্তুঙ্গ গিরি-শৃঙ্গ অতি ক্রমের ন্যায় অজ্ঞানীর নিকটে জ্ঞানকে বুঝিয়া লওয়া অত্যন্ত কঠিন হইলেও জ্ঞানীর জন্য যে ইহা সহজ তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কারণ এই যে তত্ত্বজ্ঞানের উদয়ে তাহার অজ্ঞানাবরণ একবারে বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছে। কাজেই বলিতে হয় যে, এই আবরণের স্থিতি ও অস্থিতিই মানুষকে জ্ঞানী ও অজ্ঞানী রূপ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া থাকে। যাহার অজ্ঞানাবরণ বর্ত্তমান রহিয়াছে, তিনি যদি জগন্নাথ তর্ক-পঞ্চাননের ন্যায় কৃতবিদ্য দার্শনিক হন, তথাপি অজ্ঞানীই বটেন। পক্ষান্তরে যাহার এই আবরণ অপসারিত হইয়াছে, তিনি অকৃতবিদ্য হইলেও মহান্ পণ্ডিত। তবে নিরক্ষর ভট্টাচার্য্যের কথা স্বতন্ত্র।

অন্তর্জ্জগতের বিশ্লেষণ করিয়া নিত্যবস্তু নির্ব্বাচনে যে তত্ত্ব জ্ঞান আসিয়া মানুষকে আলিঙ্গন করে ইহা বুঝিতে পারা গেল। কিন্তু এই বিষয়ে অত্যন্ত সাবধান থাকিতে হইবে যে জ্ঞানও বিষয়ের সহিত মিলাইয়া না ফেলা হয় এইজন্য যে, উহাতে বিষয়ের অনিত্যত্ব জ্ঞানের নিত্যত্বকে আচ্ছাদন করিয়া লয়। ইহাও অসত্য নহে যে, জ্ঞান ও বিষয়ের অতি নিকট সম্বন্ধ হওয়াতে অন্যোন্যাধ্যাস আত্মলাভ করিয়া উভয়কে বিপরীতভাবে বুঝাইয়া দেয়। মানুষ এইজন্য অস্থায়ী বিষয়কে স্থায়ী এবং স্থায়ী জ্ঞানকে অস্থায়ী মনে করে। তৎসম্বন্ধে গায়

জ্ঞানের বারবার পর্য্যালোচনায় এই অভ্যাসটা শিথিল হইয়া পড়িলেও তত্ত্বদর্শন না হওয়া পর্য্যন্ত একবারে অদৃশ্য হয় না। এই নৈসর্গিক অভ্যাস হইতেই আমরা ক্রমনীতিতে অসত্য বিষয়ের ক্রীতদাস হইয়া পড়িয়াছি। যেরূপ জ্ঞান ও বিষয়ের বিমিশ্রণ বাড়িতে থাকিলে মানুষ তত্ত্বজ্ঞান হইতে ক্রমশঃ দূরে সরিয়া পড়ে, সেইরূপ উভয়ের বিশ্লেষণ বৃদ্ধি অনুসারে তত্ত্বজ্ঞানের সামীপ্য বাড়িতে থাকে। কাজেই ব্রহ্ম জিজ্ঞাসুকে ঐ বিশ্লেষণের ক্রমবিকাশের প্রতি সবিশেষভাবে মনঃসংযোগ করিতে হইবে।

ব্রহ্ম কি জগতের কারণ ?

অনেক আস্তিক ও আস্তিক-দার্শনিক ব্রহ্মকে জগতের কারণ বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। এমন কি এই কারণভাব ব্যতীত এইরূপ কোন জিনিষ তাঁহারা অনুসন্ধান করিয়া পান নাই, যাহা তাঁহার ব্রহ্মভাব সম্বন্ধে উপযুক্ত মহত্ত্বের নিদর্শন হইতে পারে। পক্ষান্তরে ইহাকে বাদ দিয়া দেখিলে তিনি যেন এক তটস্থ সাক্ষীগোপালে পরিণত হইয়া পড়েন। রাজ্য-শাসন হইতে অপসৃত তপস্বী রাজার ন্যায় তিনি নিরীহ সাধু-প্রকৃতি বলিয়া অপরিগণিত না হইলেও তাঁহাকে কোন্ প্রকারে করুণা-সিন্ধু, ন্যায়পরায়ণ বিশ্বসম্রাট বলা যাইতে পারে না। আর

ইহাতে যে তাঁহার প্রতি প্রকৃতিপুঞ্জের ভক্তি অক্ষুণ্ণ থাকিতে পারে, তাঁহারও কোন অব্যভিচারী কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না কেমন তাঁহাকে রাজাসনে বিরাজমান না দেখিলে ভক্ত-মণ্ডলীর হৃদয় যেন দুঃখে বিদীর্ণ হইতে থাকে যাহাই হউক ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে কোন কার্য্যে ব্যাপৃত না থাকিয়া, কেবল নির্লিপ্ততার প্রভাবে কেহই লোকের মন আকৃষ্ট করিতে পারে না। কাহাকেও নির্গুণ বলিয়া বিখ্যাত হইলে নর নারীর ভক্তিভাজন হইতে দেখা যায় না সুতরাং এইরূপ অবস্থাতে বাধ্য হইয়া ব্রহ্মকে জগৎ-কারণ বলিতে হয়

ইহা যে একটা কঠিন সমস্যা তাহা নিঃসন্দিগ্ধ, কিন্তু অপরাপর কঠিন সমস্যার ন্যায় ইহারও সমাধান আছে। কেন না ব্রহ্মকে কারণ বলিয়া ঘোষণ করিবার অভিপ্রায় এই যে, লোকনীতিতে মৃৎ সুবর্ণ প্রভৃতি কারণের সহিত কলস ও কুণ্ডলাদি কার্য্যের যেরূপ অভিন্নতা দেখিতে পাওয়া যায়, সেই-রূপ কারণ-ব্রহ্ম হইতে কার্য্য-জগতের ভিন্ন ভাব কিছুমাত্র নাই ইহা ব্যতীত ব্রহ্ম-কারণবাদের অপর কোন উদ্দেশ্য দেখিতে পাওয়া যায় না। তবে ইহা সত্য যে, ব্রহ্ম জগদুপাদান মায়ার অধিষ্ঠান, এইজন্য মায়ার কারণ-ভাবটা তাহার উপর আরোপিত হইতে দেখা যায় কেম ন অখণ্ড নির্লেপ বস্তু যে কারণ হইতে পারে তাহার কোন উদাহরণ নাই। পক্ষান্তরে যাহা কারণ হইয়া থাকে তাহা সগুণ বা সবিকার কাযেই ব্রহ্মকে জগৎকারণ বলিলে তাঁহার নির্গুণ ও নির্ব্বিকার ভাবকে

কিছুতেই অক্ষত রাখিতে পারা যায় না বলিয়া কারণত্বের ভার মায়ার উপর দেওয়া হইয়াছে। আর সগুণত্ব পরিবর্ত্তনও বিকার যে মায়ার প্রকৃতিতে পরিণত হইয় পড়িয়াছে তাহার কথাই কি? যাহাই হউক, মায়া যে ব্রহ্মনিরপেক্ষ হইয় স্বতন্ত্রভাবে জগৎ রচনার খেলা খেলিতে পারে না ইহ অতীব সত্য এইজন্যই অবিবেকের বশবর্ত্তী হইয় মানুষ ব্রহ্মকে জগৎ কারণে পরিণত করিয়া লয় ব্রহ্ম অনাদিকাল হইতে কার্য্য ও কারণের সংস্পর্শে নির্লিপ্ত থাকিয়া আপন নির্ব্বিকার ও একরস ভাবকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া আসিতেছেন এবং অনন্তকাল পর্য্যন্ত এই ভাবেই থাকিবেন।

ব্রহ্মের কারণ ভাবটাই ক্রমনীতিতে উন্নত হইয়া তাঁহার রাজভাবে পরিণত হইয়াছে। রাজা যেরূপ আপন রাজধানীতে থাকিয়া সমস্ত রাজ্যের শাসন করিয়া থাকেন, সেইরূপ জগৎ কারণ ব্রহ্মও কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানে অবস্থিত হইয়া নিখিল জগতের ব্যবস্থা বিধান করিতেছেন সময়ে সময়ে আপনার এক এক জন প্রতিনিধিও পাঠাইয়া থাকেন এই প্রতিনিধি দেশ কালের আনুকূল্যে প্রভুর বিধান জগতে প্রবর্ত্তিত করেন এইরূপে রাজভাবের ন্যায় মাতৃভাব এবং পিতৃভাব ও কারণ-ভাবের পরিণাম বিশেষ। অধিকন্তু সখ্য বাৎসল্য ও কান্ত ভাবটা কারণভাব যে ত্রিদোষ বিকারগ্রস্ত ইহাই বুঝাইয়া দেয়

মায়াতীত অস্পর্শ নির্ব্বিকার ব্রহ্ম বস্তুতে কার্য্য-কারণ ভাব আরোপ করিতে যাওয়া আর তাঁহাকে কলঙ্ক কালিমায় আচ্ছন্ন

কথা একই কথা। এইজন্যই উপনিষদে দেখিতে পাই 'ন তস্য কার্য্যং করণঞ্চ বিদ্যতে' বিচারে মিথ্যা জিনিসের কারণ কখন সত্যবস্তু হইতে পারে না। কাজেই জগৎ মিথ্যা হওয়াতে তাহার কারণ মিথ্যা মায় ব্যতীত অপর জিনিষ নহে প্রকৃত পক্ষে ভ্রান্তিসিদ্ধ মিথ্যা বস্তু সম্বন্ধে কার্য্য-কারণ-ভাবের অনুসন্ধান করা বিশেষ দর্শিতার পরিচায়ক নহে কেননা বিশেষ-দর্শী কেবল ভ্রান্তি সিদ্ধ মিথ্যা বস্তুর অধিষ্ঠানের উপরই মনো-নিবেশ করেন এইজন্য যে উহার সাক্ষাৎকার হইলে ভ্রান্তি জ্ঞান স্বতই অদৃশ্য হইয়া যায় আর ভ্রান্তি জ্ঞানের অদর্শনে যে তজ্জনিত অনর্থ পরম্পরা থাকিতে পারে না ইহা বলাই পুনরুক্তি মাত্র এইরূপে ইহা বুঝিতে বাকি রহিল না যে, কার্য্য কারণ ভাবের বিবাদ মিটাইবার একমাত্র সর্ব্বাধিষ্ঠান পরব্রহ্মের সাক্ষাৎকারেই জীবের পরম পুরুষার্থ লব্ধ হইতে পারে

ব্রহ্ম-দর্শন

ব্রহ্ম দর্শনের বিবরণই তত্ত্বজ্ঞান। আমি স্বয়ং প্রকাশ জ্ঞানরূপ অখণ্ড নির্ব্বিকার ব্রহ্ম এইরূপ মনোবৃত্তি তাহার আকার। উত্তম অধিকারী অধ্যবসায়ের সহিত ব্রহ্ম বিচারের মহিমায় তৎক্ষণাৎ বা অবিলম্বে ব্রহ্ম দর্শন করেন অপর অধিকারীর অপেক্ষাকৃত বিলম্বে ঐ দর্শন লাভ করিয়া পরম

পুরুষার্থের ভাগী হন। বিচার যেরূপ ব্রহ্মদর্শনের অব্যবহিত কারণ, সেইরূপ উহা অন্তর্মুখতার পর ভাবীফল। বহির্মুখ ব্যক্তি মায়িক বস্তু সম্বন্ধে কৃতিনৈপুণ্য দেখাইয়া সুখ উপাধি বা যশ অর্জ্জন করিতে পারিলেও ইহাতে অকৃতকার্য্যই থাকেন। তাঁহার বুদ্ধিশক্তি বহির্বস্তুর চতুঃসীমার মধ্যে থাকিয়াই আপন কার্য্য করিতে থাকে। একাধিকবার পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, আধ্যাত্মিক বিষয় তাঁহাদের বুদ্ধি যথাযথরূপে গ্রহণ করিয়া উঠিতে পারে না। কাজেই একমাত্র অন্তর্মুখ জিজ্ঞাসু ব্রহ্ম বিচারের প্রভাবে ব্রহ্ম-দর্শন করিয়া লোকোত্তর শান্তির অধিকারী হন।

বেদান্তের ব্রহ্মদর্শন কোন জ্ঞেয় বস্তুর দর্শন নহে। এই দর্শনে মনোবৃত্তি যাইয়া জ্ঞানাকারে পরিণত হয়। এইজন্য যে স্বপ্রকাশ জ্ঞানই ব্রহ্মের স্বরূপ লক্ষণ। আর বিবেকীর বিচারে সাব্যস্ত হইয়াছে যে, যাহা জ্ঞেয় তাহাই ক্ষণস্থায়ী মনের বিজৃম্ভন মাত্র। সুতরাং এইরূপ অবস্থাতে কে নিত্য একরস ব্রহ্মকে বেদ্যবস্তু বলিয়া প্রথিত করিতে সাহস পায়? কেননা মনের বিষয়াকার পরিণাম বিশেষকে যাঁহারা ব্রহ্মদর্শন মনে করেন, তাঁহারা অন্তর্মুখতাই লাভ করিতে পারেন না। এইজন্য যে জ্ঞানের দিকে অগ্রসর হওয়াই অন্তর্মুখতার অর্থ। যদিও ব্রহ্ম-দর্শন সম্বন্ধে অনেক মতভেদ আছে, তথাপি বিশেষদর্শীর অনুভব যাহাকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করে তাহা অগ্রাহ্য করা কদাপি বিচারশীলতার পরিচায়ক নহে। পক্ষান্তরে যখন বিচারে নিত্য-

বস্তুগুলির জ্ঞানই সাধ্যস্ত হয়, তখন কোন বিষয় দর্শন লইয়া ব্রহ্মদর্শনের মীমাংসা করিতে গেলে কখন বিবেকাদ্যুমোদিত বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না।

দেখিতে পাই অনেক বিদ্যার আলোচনা করিয়াও অনেকে কোন জ্ঞেয় বস্তুকে ব্রহ্ম বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া লন। ইহার কারণ যে মনোনিবেশ বা অভিধেয় শক্তির অযথা ভাব, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। যাহাই হউক এইরূপ লোক হইতে যে অনেকের মনে কুসংস্কার জন্মিয়া যায় তাহা অস্বীকার করিতে পারা যায় না। বিশেষতঃ অধিকাংশ স্থলে এই শ্রেণী হইতেই ধার্মিক সমাজের নেতা নির্বাচিত হইয়া থাকে। কাজেই বাধ্য হইয়া বলিতে হয় 'অন্ধেন নীয়মান যথান্ধাঃ'

ব্রহ্মদর্শন হইবামাত্রই নিখিল জগৎ জ্ঞানে আলোকিত হইতে থাকে। যাহা জ্ঞানে প্রতিভাসিত নহে এমন জিনিষই অনুসন্ধানে পাওয়া যায় না। জ্ঞান একই ভাবে থাকিয়া আপনার বিশ্বব্যাপী প্রকাশ বিকীর্ণ করে, আর তাহাতে পতঙ্গের ন্যায় প্রত্যেক জিনিষ পুড়িয়া যায়। অর্থাৎ ব্রহ্মদর্শনের প্রথম অবস্থাতে জ্ঞানের সঙ্গে বিষয় প্রতীয়মান হইলেও জ্ঞানেরই প্রাধান্য দেখা যায়। যেরূপ অব্রহ্ম দর্শন অবস্থাতে বিষয় সুস্পষ্ট রূপেও জ্ঞান ভাবিয়া চিন্তিয়া বুঝা যায়, তদ্রূপ এই অবস্থাতে নহে। ইহাতে উভয়ই সমভাবে আপনাকে ব্যক্ত করে, এক মাত্র ইহাই নহে, কিন্তু বিষয়ের স্বতন্ত্র সত্তাটা জ্ঞানের সত্তায় একাকার হইয়া যায়। এই অবস্থাতে ইচ্ছা মাত্রেই ব্রহ্মদর্শন

করিতে পারেন না কেন না তিনি সমস্ত জিনিসের প্রকাশক স্বয়ং প্রকাশ জ্ঞান যখন স্বতই মন বিষয়াশক্তি হইতে নিবৃত্ত হইয়া আসে, তখনই ব্রহ্ম দর্শনের যৌবন আরম্ভ হয় আন মানিক বস্তু সম্বন্ধে চিন্তা বা ভাবনার অভাব ইহাকে পূর্ণযৌবনে উপনীত করে অধিক সময় ব্রহ্ম দর্শনে অতিবাহিত হইতে থাকিলেই অসংসক্তি অর্থাৎ বিষয়ে অনাসক্তি আসিয়া উপস্থিত হয় তখন বহুমূল্য জিনিষও মন আকৃষ্ট করিতে পারে না এমন কি হীরক-খচিত প্রাসাদ ও পর্ণশাল হইতে অধিক সুখদায়ী বলিয়া মনে হয় না কাযেই শ্রেষ্ঠী মহাশয়েরা শ্বেত প্রস্তর নির্মিত ভবনের গাথ এই স্থলে ফলোপদায়ক নহে এইরূপে ব্রহ্ম দর্শনের নিষ্ঠা বাড়িতে বাড়িতে যখন উহা ধারা-বাহিক দর্শনে পরিণত হয় তখন ব্রহ্মদর্শীর পক্ষে পদার্থাভাবনী ভূমিকায় উপনীত হইবার অবসর ঘটে এই ভূমিকাতে ব্রহ্মা তিরিক্ত কোন বস্তুর ভাবনা তাঁহার মনে আসে না মায়িক বস্তু সম্বন্ধে তিনি কেবল উপেক্ষাত্মক অনুভব করিয়া থাকেন এইজন্য ঐ বস্তুর অনুপেক্ষ জ্ঞানজনিত সংস্কার তাঁহার মনে কখন উৎপন্ন হয় না।

পদার্থাভাবনী ভূমিকার উন্নতি অন্তিম সীমায় উপনীত হইবার পরেই তুরীয়গ ভূমিকাতে জ্ঞানী আসেন এই ভূমিকায় তিনি ব্রহ্মানুভূতিতে একেবারে ডুবিয়া যান ব্রহ্মাতিরিক্ত কোন বস্তুই তাঁহার প্রতীয়মান হয় না কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে অবিলম্বেই তাঁহার জীবন-লীলা শেষ হইয়া যায়

তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়াও যে কোন কোন ব্যক্তি বিষয়াসক্তি হইতে অব্যাহতি পান না তাহার মূল হেতু ব্রহ্মাভ্যাসের ঔদাসীন্য। ব্রহ্মাভ্যাসের অর্থ যেরূপ ব্রহ্ম সম্বন্ধেই বার্ত্তালাপ, চিন্তন ও আলোচনা, সেইরূপ নিরন্তর ব্রহ্মপরায়ণ হইয়া থাক কাজেই জ্ঞানীকে সর্ব্বদা ব্রহ্মভ্যাসে নিযুক্ত থাকিতে হইবে কিন্তু সাবধান হইতে হইবে যে বিষয়ীর দীর্ঘকালব্যাপী সঙ্গ না ঘটে কেননা ইহা ধীরে ধীরে অজ্ঞাতসারে মনকে বিষয়োপ ভোগের দিকে আকৃষ্ট করে ভগবান বুদ্ধদেব বলিয়া গিয়াছেন যে যতির পক্ষে অযোগ্য ব্যক্তির সঙ্গ অপেক্ষা আজীবন একাকী থাকাও ভাল পক্ষান্তরে ব্রহ্মবস্তুর প্রত্যক্ষ করিয়াও যদি কেহ অপথে বা কুপথে পদ চালন করেন, তবে বড়ই লজ্জার কথ যাহাই হউক, নির্জ্জনে ধারাবাহিকরূপে ব্রহ্মানুভূতির অভ্যাস না করিলে জ্ঞানীও যে বিষয়পঙ্কে পড়িয়া বিরূপ হইয়া যান তাহাতে কোন সন্দেহ নাই

ব্রহ্ম স্বয়ং প্রকাশ হওয়াতে একবার তাঁহার দর্শন ঘটিলে পুনর্ব্বার দর্শনের নিমিত্ত কোন প্রয়াস করিতে হয় না . কারণ দেশ ও কাল প্রভৃতির পরিচ্ছেদক কেবল মায়িক জগত সম্বন্ধেই দেখিতে পাওয়া যায় সুতরাং এইরূপ অবস্থাতে ব্রহ্মকে একবারে ভুলিয়া যাওয়া জ্ঞানীর পক্ষে অসম্ভব হইলেও হইতে পারে কেননা ব্রহ্মদর্শন অপরোক্ষ জ্ঞান বলিয়া উক্ত হইতে যাহা নিশ্চিতরূপে স্মৃতি লইয়া আসে এইরূপ অন্যথ সংস্কার আত্মলাভ না করিয়া থাকে না অবশ্যই জ্ঞানীও বিষয়ের

প্রলোভনে পড়িয়া কলঙ্কিত হইতে পারেন কিন্তু তাই বলিয় যে তিনি ব্রহ্মাত্মার চির বিস্মৃতিতেই থাকিবেন তাহ মনে মানিয়া লইতে চ হে ন তবে ইহ সত্য যে কিছু সময়ের জন্য তাহার মনোবৃত্তি ব্রহ্মাকার ন হইয়া কেবল বিষয়াকারই হইতে পারে। নিরবচ্ছিন্ন ব্রহ্মাকারবৃত্তি একমাত্র সমাধিতেই সম্ভবপর ঐ অবস্থাতেই মনের বিষয়াকার পরিণাম মিটিয় যায় ব্যুত্থান অবস্থায়ও অবশ্য জ্ঞানীর ব্রহ্মাকারবৃত্তি হইয়া থাকে ; কিন্তু ধারাবাহিকরূপে নহে কেননা ক্ষণভেদে ব্রহ্মাকার ও বিষয়াকার পরিণাম হইতে দেখ যায় আর ইহাতেই বা কি সন্দেহ যে, মনের বিষয়াকার পরিণাম ব্যতীত বিষয়ের প্রতীতিই অসম্ভব তথাপি বিষয়াকারবৃত্তির মাত্রা কমাইয়া ব্রহ্মাকারবৃত্তির মাত্রা বাড়াইতে হইবে এইরূপে অল্প সময়ের জন্য মনের বিষয়াকার ও অধিক সময়ের জন্য ব্রহ্মাকার পরিণামেই ব্যুত্থান অবস্থা অতিবাহিত করা উচিত কিন্তু বিষয় যে ক্ষণভঙ্গুর অসত্য এইরূপ ধারণাকে নিরন্তর হৃদয়ে স্থান দিতে হইবে কেননা নিখিল অনর্থের আবির্ভাব বিষয়ের সত্যত্ব বিপর্য্যাস হইতে ঘটিয় থাকে। আর জ্ঞানীও যদি দেহক প্রভৃতি বিষয়কে সত্য বলিয়া গ্রহণ করেন, তবে অজ্ঞানী হইতে তাঁহার বৈলক্ষণ্য কি থাকে ? তবে ইহা সত্য, কেবল বিষয় সমূহকে অসত্য জানিলেই জ্ঞানী হইতে পারা যায় না কিন্তু 'ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা জীবো ব্রহ্মৈব কেবলম্' এইরূপ নিশ্চয়াত্মক জ্ঞানই জ্ঞানিত্বের পরিচায়ক।

ব্রহ্মদর্শনের পরেও জ্ঞানীর বিষয়ানুভূতি হইয়া থাকে, কিন্তু তাই বলিয়া যে তিনি অজ্ঞানীর ন্যায় বিষয়ে আসক্ত হইয়া পড়েন তাহা নহে এইজন্য জ্ঞানী বিষয়কে অসত্য ও অজ্ঞানী সত্য জানে। কাযেই মিথ্যা বস্তুতে আসক্ত হওয়া প্রকৃতিস্থ ব্যক্তির পক্ষে একপ্রকার অসম্ভব। জ্ঞানীর সত্যের নিশ্চয়জনিত আসক্তি বিষয়ে নাই বলিয়াই বিষয়ানুভূতি তাঁহাকে ব্রহ্মদর্শনে বঞ্চিত করিতে পারে না। তিনি প্রত্যেক বিষয়ের প্রকাশরূপ চিন্ময়-ব্রহ্মকে বিষয়ানুভূতির পরক্ষণে বা সঙ্গে সঙ্গেই অনুভব করিয়া থাকেন।

ব্রহ্ম স্বয়ংপ্রকাশ এইজন্য তাঁহার স্বরূপ সর্ব্বদা অপরোক্ষ হইলেও আবরণভঙ্গের নিমিত্ত ব্রহ্মাকার অপরোক্ষ বৃত্তির আবশ্যকতা আছে। কাযেই এই বৃত্তির অভ্যুত্থানে যাহাদের আবরণ ভঙ্গ হয় নাই তাহাদের পক্ষে স্বপ্রকাশ ব্রহ্মও অপ্রকাশিতই থাকেন। আর ব্রহ্মও অপ্রকাশিত থাকেন বলিয়াই তাহাদের মধ্যে অনেকে কল্পনার বেলুনে উড়িতে থাকে অর্থাৎ কেহ না কোন অনাত্ম বস্তুকে পরব্রহ্ম মনে করিয়া লয়। পশ্চাৎ এই বিপর্য্যাসটা তাহাদের মনে এত জমিয়া যায় যে বিশেষদর্শীর উপদেশও এই সম্বন্ধে ফল প্রসব করিতে পারে না। কেহ নিরাকার ব্যক্তি বিশেষকে এবং কেহ সাকার মনের মানুষকে হৃদয়ের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা করিয়া লয়। যাহাই হউক ব্রহ্মদর্শন না হইলে মানুষ যে মায়িক বস্তু লইয়াই খেলা করিতে থাকে ইহাতে কোন সন্দেহ

নাই তবে অন্ধ বিশ্বাসের প্রভাবে মনকে প্রবোধ দিবার জন্য তাহাদের নিকটে যথেষ্ট উপকরণ স্বতই আসিয়া উপস্থিত হয়। কিন্তু শান্তি ও বিষয়োপরতির অযথা ভানই তাহাদের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়

ব্রহ্মদর্শন যেরূপ জীবের আসল স্বরূপকে ব্রহ্ম বুঝাইয়া দেয়, সেইরূপ প্রত্যেক জিনিষের সার অংশকেও ব্রহ্মে পরিণত করে কেনন যখন বস্তুর বিশ্লেষণ করিতে যাইয়া যে সূক্ষ্ম গুণের স্তর দেখিতে পাওয়া যায় ঐ গুলিকে ইন্দ্রিয়বোধ ব্যতীত অপর জিনিষ বলিতে পারা যায় না বলিয়া ঐ গুলি যে ক্ষণভঙ্গুর ইহা স্বীকার করিতে হয়, তখন এক অখণ্ড অপরিবর্ত্তিত প্রকাশরূপ জ্ঞানকেই ঐ গুলির সার অংশ বলিতে হইবে আর এই প্রকাশরূপ জ্ঞান যে একভাবেই প্রত্যেক জিনিষে অনুস্যূত ইহা বিচারশীল ব্যক্তির অবোধগম্য নহে তিনি সুস্পষ্টরূপে দেখিতে পান যে, গুণের স্তরগুলি স্বয়ং প্রকাশ-জ্ঞানেই আত্মলাভ করিয়া তৎক্ষণাৎ বিলীন হইয়া যাইতেছে পক্ষান্তরে ঐ স্তর গুলিকে বাদ দিয়া দেখিলে ঐ জ্ঞান ব্যতীত কোন স্থায়ী বস্তু খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, এইজন্য পরিশেষে বাধ্য হইয়া ঐ জ্ঞানকেই বস্তুর সার অংশ বা আসল স্বরূপ বলিতে হয় পরমাণু ব অতি পরমাণু যে অতীন্দ্রিয় বলিয়া অজ্ঞেয়তার সূচিভেদ্য অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন ইহা পূর্ব্বে সূচিত হইয়াছে।

বন্ধন নিবৃত্তি।

ব্রহ্মদর্শন হইলেও বন্ধন-নিবৃত্তি হইয়া যায় এইজন্য যে, উহাতে যেরূপ আপনাকে নির্লেপ, অকর্ত্তা ও অভোক্তা বলিয়া বোধ হয়, সেইরূপ সমস্ত জগৎটা ক্ষণবিনাশী ইন্দ্রিয়বোধ বা মনোবিলাসে পরিণত না হইয়া থাকে না আর যখন সকল বন্ধনের মূলে আত্মা অভীষ্ট বিষয়ে লিপ্ত, সৎ বা অসৎকর্ম্মের অনুষ্ঠাতা এবং শুভাশুভ ফলের উপভোগকারী এইরূপ সংস্কারের ন্যায় জগতের সকল জিনিষগুলি স্থায়ী, সত্য এইপ্রকার দৃঢ় নিশ্চয়কেও দেখিতে পাওয়া যায়, তখন ঐরূপ অবস্থাতে বন্ধন আসিয়া কিরূপে নিজের প্রভুত্ব দেখাইতে পারে? যদ্যপি ব্রহ্মদর্শনের পূর্ব্ববর্ত্তী সময়ের ন্যায় পরবর্ত্তী সময়েও মায়িক বস্তুর প্রতীতি বন্ধ হয় না, তথাপি জ্ঞানী, অজ্ঞানীর ন্যায় উহাকে স্থায়ী বা সত্য মনে করেন না। এইরূপে তিনি কর্ম্ম এবং তৎফল-ভোগে প্রবৃত্ত হইয়াও আপনাকে অকর্ত্তা ও অভোক্তাই জানেন এই স্থলে ইহাও বিবেচ্য যে ঐ প্রতীতিটাও তাঁহার পক্ষে উপেক্ষাত্মকই হইয়া থাকে কেননা অনুপেক্ষারূপ প্রতীতি-সংস্কার জন্মাইয়া স্মৃতি লইয়া আসে আর বস্তুর স্মৃতি যে উহাতে মানুষকে আসক্ত করিয়া তুলে তাহার দৃষ্টান্ত সচরাচর পাওয়া যায়

ব্রহ্মসত্তা হইতে মায়া বা মায়িক বস্তুর স্বতন্ত্র সত্ত্ব নাই

এইরূপ সুদৃঢ় নিশ্চয়েই বন্ধন নিবৃত্তির ব্যাখ্যা হয়। এই ব্যাখ্যায় জ্ঞানী মায়িক বস্তু অনুভব করিয়াও যে অসত্যই মনন করেন ইহাই সূচিত হইয়া থাকে। তবে সমাধিতে যে তিনি ব্রহ্ম ব্যতিরেকে অপর কোন বস্তুর অনুভব করেন না তাহা অতীব সত্য। কিন্তু তুরীয়গা ভূমিকা ছাড়া সমাধি চিরকালের জন্য না হওয়াতে অন্যান্য ভূমিকায় ব্যুত্থান অবশ্যম্ভাবী। আর ব্যুত্থানে যে অনাত্ম বস্তুও তাঁহার প্রতীয়মান হয় তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কাযেই তুরীয়গা ভূমিকাতে উপনীত হইয়া যখন যতি চির-সমাধিতে নিমগ্ন হইয়া যান, তখনই তিনি মায়িক বস্তুর প্রতীতি হইতে সম্পূর্ণরূপে অব্যাহতি পান।

বন্ধন নিবৃত্তিই মুক্তির বিবরণ। মৃত্যুর পরে অলৌকিক অবস্থা বিশেষকে যাঁহারা মুক্তি মনে করেন, তাঁহারা উপনিষদ্-বেদ্য পুরুষের কোন ঠিক খবর পান নাই। কেননা ঐ পুরুষ নিত্যমুক্ত, বলিয়া তাহার পক্ষে অবস্থা বিশেষে উপনীত হওয়া অসম্ভব। যদ্যপি বন্ধন নিবৃত্তিরূপ মুক্তিও এইরূপ প্রণালীতে তাহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠে, তথাপি অবোধকে প্রবোধ দিবার জন্য মিথ্যা বন্ধনের মিথ্যা নিবৃত্তি কল্পিত হইয়াছে। এইজন্যই জ্ঞানীর দৃষ্টিতে বন্ধনের ত্রৈকালিক অভাব ধরা পড়ে। জ্ঞানী অনুভব করিয়া থাকেন যে, ব্রহ্মাত্মা নিরন্তর বন্ধন-মুক্তিতে নির্লিপ্ত থাকিয়া আপন একরসভাব ব্যক্ত করিতে-ছেন। তবে উপাধির দোষ গুণ যে উপহিত বস্তুতে আরোপিত হয় তাহার অনেক উদাহরণ পাওয়া যায়। পরন্তু ভ্রান্তি-

বিজৃম্ভিত বন্ধন যখন মিথ্যা, তখন তাহার নিবৃত্তি কি প্রকারে সত্য হইতে পারে? পক্ষান্তরে ভ্রান্তি-বিলসিত বন্ধন নিবৃত্তিকে যদি অধিষ্ঠানরূপ বলা যায়, তবে বন্ধন-নিবৃত্তি যাইয়া ব্রহ্মেই পরিণত হইয়া থাকে। আর ইহাতে জ্ঞানীর ন্যায় অজ্ঞানী মুক্ত হইয়া উঠে কেনন উভয়ের ব্রহ্ম একই বস্তু। তথাপি বন্ধন নিবৃত্ত হইয়া গিয়াছে এইরূপ দৃঢ় নিশ্চয় কেবল জ্ঞানীরই দেখিতে পাওয়া যায় বলিয়া তাঁহাকে মুক্ত এবং অজ্ঞানীর তাহা নাই বলিয়া তাহাকে বদ্ধ বলা যাইতে পারে।

ব্রহ্মাত্মা স্বরূপতঃ বন্ধন হইতে সর্ব্বদা মুক্ত থাকিলেও অজ্ঞানী ইহা বুঝিয়া উঠিতে পারে না। সে আপনাকে অবিদ্যার বন্ধনে দৃঢ়বদ্ধ বলিয়া মনে করে। পরন্তু যখন ব্রহ্মবিদ্যার অনুশীলন করিয়া তাহার তত্ত্বদর্শন হইয়া যায়, তখন সে অজ্ঞান অবস্থার কথা স্মরণ করিয়া মনে মনে লজ্জিত হইয়া পড়ে। অজ্ঞানীই লোকান্তর ও জন্মান্তর আত্মার কল্পনা করিয়া তাহা হইতে অব্যাহতি পাইবার নিমিত্ত তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে ব্যগ্র হইয়া উঠে। কিন্তু উহা লব্ধ হইলে সে বুঝিতে পারে যে, এক চিন্ময় আত্মাকে অবলম্বন করিয়া জল-তরঙ্গিণীতে মায়া জন্ম-মরণের খেলা খেলিতেছে। মায়াই উৎপন্ন হইয়া মৃত্যুর পরে ব্রহ্মে পরিণতি লাভ করিতেছে বলিয়া আত্মা উহা হইতে সর্ব্বদাই মুক্ত রহিয়াছে। মায়ার প্রভাবেই জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। কেননা মৃত্যুর পরে যে ব্যক্তিত্ব বর্ত্তমান থাকে তাহার কোন অব্যভিচারী উদা-

স্মরণ বা প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে ইহা সত্য যে এক ব্যক্তির মৃত্যুতে অপর নব ব্যক্তির আবির্ভাব হইলেও উভয়ের আত্মা একই জিনিষ। সুতরাং আত্ম এক বলিয়া নরেন যে পূর্ব্ব জন্মে উপেন ছিল ইহা বলিতে পারা যায় আর প্রত্যেক বস্তুর আসল স্বরূপ যে আত্মা ইহ ইতঃপূর্ব্বে ব্যক্ত হইয়াছে

জন্মান্তরবাদের কোন নির্দ্দোষ ব্যাখ্যা আজ পর্য্যন্তও দৃষ্টি পথে আসে নাই আর স্বতন্ত্র সূক্ষ্ম শরীর যখন সুষুপ্তিতে থাকে না, তখন উহা যে মৃত্যুতেও বর্ত্তমান থাকে ইহ কি প্রকারে বলপূর্ব্বক মানিয়া লইতে পারা যায়? কেননা স্থূল শরীরের সাহায্য ব্যতীত যে সূক্ষ্ম শরীর কোন কার্য্য করিতে পারে না ইহা যদি সত্য মানা যায়, তবে এক শরীর হইতে অপর শরীরে তাহার প্রবিষ্ট হওয়া অসম্ভব হইয় পড়ে যখন দেখিতে পাই, এক ব্যক্তির তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া বন্ধন-নিবৃত্তি হইলেও অপর ব্যক্তি বন্ধনেই থাকে, তখন স্বরূপতঃ ও মূলতঃ জীব এক হইলেও তাহার অন্তঃকরণাদি বিভিন্ন উপাধি মানিতে হইবে। যে উপাধি অংশে তত্ত্বজ্ঞান জন্মে তৎসম্বন্ধেই বন্ধন নিবৃত্ত হয় কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, নিবৃত্তিতেও উহা প্রতীয়মান হইতে থাকে কে না জানে যে, আকাশে নীলিমা নাই, কিন্তু সকলেই প্রত্যক্ষত উহাকে নীলবর্ণের অনুভব করিয়া থাকে বন্ধন-নিবৃত্তির এই গূঢ় রহস্য ভেদ করিতে না পারিয়া অনেকেই জ্ঞানী যে বন্ধনে রহিয়াছেন ইহ ধারণ করিয়া লয়। কেনন ব্যবহার সম্বন্ধে অজ্ঞানী হইতে তাঁহার সবিশেষ পার্থক্য

দেখিতে পাওয়া যায় না তবে নিশ্চয় ও ধারণার দিক দিয়া দেখিলে আকাশ পাতাল ভিন্নত বোধ হয় কাযেই জ্ঞানীকে বুঝিতে যাইয়া যিনি নিশ্চয় ও ধারণাকে বাদ দেন এবং ব্যবহারকেই শক্ত করিয় ধরিয়া বসেন, তাঁহাকে যোগ্য পরীক্ষক বলা যাইতে পারে না

বন্ধন অবস্থাতে যেরূপ মায় বিবিধ রচনা ঘটিতে থাকে, সেইরূপ প্রবুদ্ধ অবস্থাতেও দেখা যায় ভিন্নতা কেবল নিশ্চয় ও ধারণা সম্বন্ধে এইজন্যই প্রবাহরূপে মায়াকে অনাদি অনন্ত বলা হইয়াছে শুদ্ধ নিত্যমুক্ত ব্রহ্মাত্মার অবলম্বনে যে মায়া বন্ধন-মুক্তির লীলা খেলা করিতেছে ইহা তত্ত্বজ্ঞান লাভ হইলেই সুস্পষ্টরূপে বুঝিতে পারা যায় অজ্ঞানী ইহার সংবাদ রাখেন না বলিয়াই আজীবন সংসারের জঞ্জালে পড়িয়া থাকেন মায়ার এইরূপ লীলা খেলা তেও যে, ব্রহ্ম নির্ব্বিকার থাকেন এই মহিমা তাঁহার কম নহে। মায়ার সহিত মিলাইয়া দেখিলে যাঁহাকে জগতের ভাল মন্দ কার্য্যে লিপ্ত বলিয়া বোধ হয়, তিনিই বিশ্লেষণরীতিতে নির্ব্বিকার, নির্লেপ, অখণ্ড, স্বপ্রকাশ সচ্চিদানন্দময় হইয় উঠেন। তিনিই জীবের ন্যায় নিখিল জিনিষের আসল স্বরূপে পরিণত হইয়া পড়েন। তাঁহাকেই তত্ত্বজ্ঞানী আপন আত্ম বলিয়া জানিবার সঙ্গে সঙ্গেই লোকোত্তর আনন্দে নিমগ্ন হইতে থাকেন।

জ্ঞানীর নিশ্চয় ও ধারণা একভাবে সর্ব্বদা বর্ত্তমান থাকে এইজন্য তাঁহার পক্ষে উভয়কে সত্য এবং অজ্ঞানীর নিশ্চয়

এবং ধারণাকে প্রবুদ্ধ অবস্থাতে কলেবর পরিবর্ত্তন করিতে দেখা যায় বলিয়া অসত্য বলা হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে যাহার 'আমি সচ্চিদানন্দময় ব্রহ্ম' এইরূপ নিশ্চয় এবং 'ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা' এই প্রকার ধারণার বৈপরীত্য ঘটে তাহাকে জ্ঞানী না বলিয়া অজ্ঞানী বলাই যুক্তিযুক্ত। সংসারে যে জ্ঞানীর সং সাজিয়া অনেক অজ্ঞানী আপনার লোকৈষণা ও বিত্তৈষণার শ্রীবৃদ্ধি করিয়া থাকে তাহার উদাহরণ সচরাচর পাওয়া যায়। পঞ্চনদ প্রদেশে এইরূপ সং সাজিবার মাত্রাটা অধিক হইলেও অপরাপর দেশে যে ইহা নাই তাহা বলিতে পারা যায় না। অধিকন্তু ইহা সত্য যে এইরূপ সং সাজিয়া সুদীর্ঘ কাল ধরা না পড়িয়া থাকিতে কাহাকেও দেখা যায় না। তবে রচনাচাতুর্য্য ও তাহার অভাবে উহার ইতর বিশেষ আছে। যাহাই হউক প্রকৃত জ্ঞানী যে এই পৃথিবীতে অতীব কম তাহা অস্বীকার করিতে পারা যায় না।

অদ্বৈতবাদের আশয়

অদ্বৈতবাদ হইতে ইহা বুঝিতে পারা যায় যে বিশ্বসমষ্টির অপরাপর অংশ নানা, সখণ্ড, সবিকার ও পরপ্রকাশ্য হইলেও আসল অংশ এক, অখণ্ড, নির্ব্বিকার ও স্বয়ংপ্রকাশ।

এই আসল অংশের দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া অপরাপর অংশের মীমাংসা করিতে গেলে যেরূপ বিশৃঙ্খলা আসিয়া উপস্থিত হয়, তদ্রূপ ক্ষণভঙ্গুরবাদ ও শূন্যবাদের ঘটিক কিছুতেই থামাইয়া উঠিতে পারা যায় না। আর বৌদ্ধ দার্শনিকের যে এই বাদ-যুগলে অঙ্গ ঢালিয়া দিয়াছিলেন, তাহার কারণ তাঁহারা আসল অংশকে বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই তবে তাঁহারা মায়িক ভাগের বিশ্লেষণে এতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন যে মায়ার স্বভাবকে আমূলতঃ ধরিয়া লইতে কোন ত্রুটি দেখান নাই যাহাই হউক, আসল অংশকে বাদ দিয়া কেবল মায়ার দিক্ দিয়া দেখিলে যেরূপ ক্ষণিক-বিজ্ঞানবাদ ও শূন্যবাদকে একটা খামখেয়ালী বাদ বলা যাইতে পারে না, তদ্রূপ এই বাদযুগল হইতে মনুষ্যের মনে তীব্র বৈরাগ্যের আবির্ভাব হইয়া পড়ে কেননা ভাবপুঞ্জ আত্মলাভ করিয়াই বিলীন হইয়া যাইতেছে এবং কোথাও স্থায়ী সত্ত অনুসন্ধানে পাওয়া যায় না বলিয়া পরিশেষে শূন্যে পরিণত হইতেছে এইরূপ অমোঘ ধারণায় কে ঐ গুলিকে সর্ব্বস্ব মনে করিতে পারে?

নিখিল বস্তুর আসল স্বরূপ এক হইলেও গুণ ও ক্রিয়া যে বিভিন্ন তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কাযেই যাঁহারা মায়াস্তু লইয়া কল্পনার গন্ধর্ব্ব নগর বসাইয়াছেন অদ্বৈতবাদ হইতে তাঁহাদের সবিশেষ অপকার হইবার নহে। তবে ইহা সত্য যে ঐ নগরের সুষমায় আত্মহারা হইয়া বা কল্পনাকে সত্য মনে করিয়া অদ্বৈতবাদী আজ পর্য্যন্তও ভাবে অচেতন হইতে

পারেন নাই পারিবেন কি প্রকারে, বিশেষদর্শন অবস্থাতে নানাত্বের মূলে কেবল অপ্রমার কারুকার্য্যই দেখিতে পাওয়া যায় যাহাই হউক, যখন অদ্বৈতবাদ নানাভাবের প্রতীতি বন্ধ করিতেছে না, তখন তাহা হইতে ভেদবাদের সমূলে উচ্ছেদ কি প্রকারে হইতে পারে ? আর এই প্রতীতি যে ভেদবাদের মূলে রহিয়াছে তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই কাযেই যাহারা নানাভাবের প্রতীতিকে পরীক্ষার তুলাযন্ত্রে তুলিতে কুণ্ঠিত হয়, অদ্বৈতবাদ তাহাদিগকে অবিশেষদর্শী বলিয়া ঘোষণা করিলেও মূলধনে বঞ্চিত করে নাই

অনেকে মনে করে অদ্বৈতবাদ এই শিক্ষা দেয় যে, ব্রহ্ম ব্যতীত অপর কোন জিনিষ প্রতীয়মান হয় না। ইহা ঠিক নহে এইজন্য যে অদ্বৈতবাদের অভিপ্রায় অবিষম্বাদিত সত্য বস্তু একমাত্র ব্রহ্ম, তদতিরিক্ত সকল বস্তুই কেবল প্রতীতির সময়ে সত্য উহার পূর্ব্বে বা পরে ঐ বস্তুর অস্তিত্ব ধরিয়া উঠিতে পারা যায় না এই স্থলে ইহাও বিবেচ্য যে প্রতীতি এবং অস্তিত্বের আখ্যা সম্বন্ধে পার্থক্য থাকিলেও স্বরূপতঃ কোন ভিন্নতা নাই এইরূপে যাহারা অদ্বৈতবাদে কাচ কাঞ্চনের একাকার হইবার অভিযোগ লইয়া আসে, অদ্বৈতবাদ যে গুণ ও ক্রিয়াগত বস্তুর বৈষম্য বিলোপ করে না ইহা তাহারা ভুলিয়া যায় আর গুণ ও ক্রিয়াকে বাদ দিয়া কাচ ও কাঞ্চনের আসল স্বরূপ যে ব্রহ্মে পরিণত হইয়া পড়ে তাহা ইতঃপূর্ব্বে সূচিত হইয়াছে। কাযেই এইরূপ অবস্থাগত মায়িক

বস্তুর বিভিন্নত প্রতিপন্ন হইলেও মায়াতীত পরব্রহ্মের অদ্বৈত-ভাব অক্ষুণ্ণই থাকে। মায়া অনির্বচনীয় বিবিধ বেশে আপনি নাচিতে ও অজ্ঞানীকে নাচাইতে থাকিলেও ব্রহ্ম এক অখণ্ড ভাবে অনাদি অনন্তকাল বিরাজমান রহিয়াছেন।

অদ্বৈতবাদ ব্যবহারিক বস্তুকে ভ্রান্তিবিজৃম্ভিত বলিয়া ঘোষণা করিলেও উহার ব্যবহার বন্ধ করেন না। কেননা রজ্জুতে সর্প-ভ্রান্তি স্থলে ভয়ে পলায়ন ও সর্প সংহারার্থ লাঠি গ্রহণ প্রভৃতি ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। তবে ইহা সত্য যে, অদ্বৈত-বাদের মর্ম্ম যথারীতি বুঝিয়া লইলে ব্যবহারের প্রতি আস্থা ক্রমশঃ ক্ষীণ হইতে থাকে। কেননা ইহাতে আসক্ত হইয়া পড়িলে যেরূপ তত্ত্বজ্ঞানের দিকে যাইবার সুগম পথ হারাইয়া ফেলিতে দেখা যায় সেইরূপ নিরন্তর মন বিক্ষিপ্ত থাকাতে অশান্তিতেই কাল হরণ করিতে হয়। পুরাকালের ব্রহ্মর্ষি ও রাজর্ষিরা এইজন্যই অনাসক্তভাবে নিখিল ব্যবহার সম্পাদন করিতেন। তাঁহারা প্রথমে ব্রহ্মবিচারের প্রভাবে ব্রহ্ম জ্ঞান লাভ করিয়া পরে বৈষয়িক ব্যবহারে নিযুক্ত হইতেন। কাযেই স্বার্থের সংস্পর্শে অজ্ঞানীর ন্যায় তাঁহারা আত্মহারা হইয়া আপন অমনুষ্যত্ব দেখাইতেন না। কিন্তু প্রত্যেক ব্যবহারের মূলে তাঁহাদের লোকসংরক্ষণই ব্যক্ত হইয়া পড়িত। যাহাই হউক ব্যবহারিক বস্তুকে ভ্রান্তিবিলসিত না জানিলে মানুষ কিছুতেই সে ব্যবহারে আসক্ত না হইয়া থাকিতে পারে না ইহা অতীব সত্য। আর যখন মায়িক বস্তুর অস্তিত্ব প্রতীতির

পূর্ব্বে বা পরে না দেখিয়া একমাত্র প্রতীতি সময়েই দেখিতে পাওয়া যায়, তখন উহাকে ভ্রান্তিপ্রসূত বলাতে কোন অন্যায় হইবার নহে কেননা শুক্ত রজত প্রভৃতি ভ্রমস্থলে ঐরূপই দেখিতে পাওয়া যায় তবে তুল্যরূপে বস্তুর পুনরাবৃত্তি দেখিয়া তাহাকে সত্য মনে করিবার কথা স্বতন্ত্র

অদ্বৈতবাদে ইহা সবিশেষভাবে বিবেচ্য যে, "ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা জীবো ব্রহ্মৈব কেবলম্" এই ধ্রুব সত্য কেবল তত্ত্বজ্ঞানীর জন্য যাহারা অপ্রবুদ্ধ রহিয়াছে তাহাদের নিমিত্ত লৌকিক বা বৈদিক ক্রিয়াকলাপ অদ্বৈতবাদ বন্ধ করে না। কেনন যিনি ত্রিবিধ বাসনার প্রলোভনে পড়িয়া রহিয়াছেন এইরূপ ব্যক্তির পক্ষে প্রবৃত্তিমার্গই উপযোগী আর ইহাতেই বা কি সন্দেহ যে, ঐ বাসনার গোলক ধান্ধায় পড়িয়া যদি মানুষ প্রবৃত্তিমার্গে আরূঢ় না হয়, তবে বিপথে যাইয়া তাহাকে নিশ্চয়ই অপদস্থ হইতে হইবে অপ্রবুদ্ধ ব্যক্তিরা ধার্ম্মিক বা সামাজিক শাসনশৃঙ্খলে আবদ্ধ না হইলে ক্রমনীতিতে যে পামরে পরিণত হইয়া পড়িবে তাহতে কি সন্দেহ আছে? আর বর্ত্তমান পৃথিবীতে যে ঐ শাসনের উশৃঙ্খলতায় পামরের দল দিন দিন বাড়িতেছে তাহার অনেক উদাহরণ পাওয়া যায় কাযেই এইরূপ অবস্থায় কোন্ জ্ঞানী সকলকেই এক মাপের কোর্ট পরাইতে সাহস পায়? অধিকারী অনুসারে কর্ম্ম, উপাসনা ও জ্ঞানের যথাযথ বণ্টনেই বিচারশীলতার পরিচয় হইতে পারে অনধিকারীকে জ্ঞানীর আসনে বসাইতে চেষ্টা

করিলে অবশ্যই তাহার বিষময় ফল দাঁড়াইবে এইজন্য যিনি সাধনচতুষ্টয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন তিনিই অদ্বৈততত্ত্বের শ্রবণে অধিকারী বলিয়া নিরূপিত।

অদ্বৈতবাদ ইহাও জ্ঞাপন করে না যে, জ্ঞানীকে অবশ্যই শ্বাপদসমাকুল অরণ্যানি আশ্রয় করিতে হইবে, কেন না জনক ভীষ্ম ও অর্জ্জুন প্রভৃতি রাজর্ষি এবং নীব চূড়ামণি ব্রাহ্মণকে সংসারের গুরুতর কার্য্যে আমরা ব্যাপৃত থাকিতে শুনিতে পাই। আর যখন বস্তুর গ্রহণের ন্যায় উহার পরিত্যাগ ও ভ্রান্তিবিলসিত বলিয়া অদ্বৈতবাদে উপদিষ্ট হইয়াছে তখন যিনি তত্ত্বজ্ঞান লাভের পর লোকহিতার্থ জীবন উৎসর্গ করিয়া নির্লিপ্তভাবে সংসারে অবস্থিত থাকেন, তাঁহাকে কি প্রকারে বাম শ্যামের তুল্য বলিয়া মনে করা যাইতে পারে? তবে ইহা সত্য যে যিনি পদার্থভাবনী বা তুরীয়গ ভূমিকাতে উপনীত হইয়াছেন তাঁহার জন্য লোকালয়ও নির্জ্জন হইয়া পড়ে। যাহাই হউক বর্ত্তমান সময়ে যে ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থের বড় আবশ্যকতা ইহাতে কোন সন্দেহ নাই কেনন যিনি জন সাধারণের উপর নেতৃত্ব করিবেন তিনি যদি অপ্রবুদ্ধ হন, তবে কখন স্বার্থের সংস্পর্শে কলুষিত না হইয়া থাকিতে পারিবেন না। তত্ত্বজ্ঞান ব্যতীত এমন জিনিষ বিরল যাহার প্রভাবে মনুষ্য স্বার্থের মোহিনী মূর্ত্তি দেখিয়া স্থির থাকিতে পারে সচরাচর দেখিতে পাই অনেক অতত্ত্ব-জ্ঞানী নেতারা সাধারণের হিত করিতে যাইয়া পরিশেষে আপনারই হিত করিয়া ফেলেন। এই জগতে এইরূপ লোক

কমই দেখিতে পাওয়া যায়, যিনি সাধারণের হিতকে আপনার হিত মনে করিতে পারেন আর এইরূপ মনে না করিতে পারিলে উহা যে অহিতের মিশ্রণে অবিশুদ্ধ হইবেনা ইহা নিশ্চয় করিয়া কে বলিতে পারে?

অদ্বৈতবাদে যে বিধিমুখ ও নিষেধমুখ বাক্য দেখিতে পাওয় যায় তাহাও উদ্দেশ্যবিহীন নহে লোকনীতিতেও রজ্জুতে মালা প্রভৃতি ভ্রান্তিস্থলে ভ্রান্ত ব্যক্তিকে প্রবোধ দিবার জন্ত এই সবই রজ্জু এবং এইখানে মাল প্রভৃতি কিছুই নাই বিধিমুখ ও নিষেধমুখ দুই প্রকার বাক্য প্রযুক্ত হইতে দেখিতে পাওয় যায় যদ্যপি উভয় প্রকারের বাক্যই ভ্রান্তকে প্রবুদ্ধ করিয় দেয়, তথাপি প্রথম হইতে সাক্ষাৎরূপে এবং দ্বিতীয় হইতে পরম্পরাতে অধিষ্ঠানের জ্ঞান জন্মে অধিকারি ভেদে উভয় প্রকারের বাক্য আবশ্যক বলিয়া দ্বিতীয় বাক্যের অবতারণ নিষ্ফল নহে যেরূপ রজ্জুতে সর্পের আরোপ করিয় আতঙ্কে কম্পমান ব্যক্তির পক্ষে ইহা সর্প নহে এইরূপ নিষেধমুখ বাক্যই উপযোগী, তদ্রূপ যে মুমুক্ষু সংসারের ত্রিতাপে অত্যন্ত কাতর হইয়া উহার নিবৃত্তিই প্রথমে ইচ্ছা করে, তাহার জন্যও ঐরূপই বটে আর যখন যে ঐরূপে সর্প আরোপ করিয়া উহার প্রতিকারের নিমিত্ত নির্ভয়ে জিজ্ঞাসা করে সম্মুখস্থ দীর্ঘাকৃতি জিনিষটা কি, তাহার প্রতি ইহ রজ্জু এইরূপ উত্তরই সমুচিত, তখন যিনি ঐ ত্রিতাপের বেগ সহ্য করিয়া অকাতরে জিজ্ঞাসা করেন যে, মায়িক

জগতের প্রকৃত তত্ত্ব কি, তাঁহার প্রতি এই জগতের আসল স্বরূপ ব্রহ্মই এই প্রকার উত্তরই গ্রাহ্য।

মায়িক বস্তু কে দেখে?

মায়িক বস্তুর দ্রষ্টা মায়াতীত পরব্রহ্মকে বলিলে তাঁহার নির্লেপ ও অসঙ্গভাবের উপর কলঙ্ক লাগে। এইরূপে জ্ঞানীর বিচারে জীবের আসল স্বরূপ ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন বলিয়া উঁহাকেও দ্বৈতদর্শী বলা যাইতে পারে না। কাজেই জীবের নকল স্বরূপটার উপরই বাধ্য হইয়া দ্বৈতবস্তু দেখিবার ভার দিতে হয়। আর অজ্ঞানীর জীবের নকল স্বরূপ লইয়াই সমস্ত খেলা খেলিতে থাকে এইজন্য তাহাদিগকেই মুখ্যতঃ দ্বৈতদর্শী বলা উচিত। যদ্যপি জ্ঞানীরও দ্বৈতবস্তু দেখে, তথাপি অজ্ঞানীর ন্যায় উহাকে সত্য ও আপন আসল স্বরূপকে ঐ ব্যাপারে লিপ্ত মনে করে না। সুতরাং ব্যুত্থান অবস্থাতে মায়িক জিনিষ দেখিয়াও জ্ঞানী যে স্বরূপদৃষ্টিতে ঐ ব্যাপারে নির্লিপ্তই থাকে যেরূপ ইহা প্রতিপন্ন না হইয়া রহিল না, সেইরূপ দৃশ্যের বস্তুকে অসত্য এবং আপনাদের প্রকৃত স্বরূপকে উপস্থিত বিষয়ে নির্লিপ্ত মনে করিয়া মায়িক জিনিষ দেখাতে যে তাঁহার পক্ষে কিছু আসে যায় না তাহাও বুঝিতে পারা গেল।

জীবের আসল স্বরূপ মায়াতীত পরব্রহ্ম হইলেও তাহার নকল স্বরূপটা যে মায়িক তাহাতে কোন সন্দেহ নাই আর যেরূপ মোল্লার দৌড় মস্‌জিদ পর্য্যন্ত, তদ্রূপ অজ্ঞানী এই নকল স্বরূপের গণ্ডীর ভিতরে থাকিয়াই নিজের বাহাদুরী দেখাইতে থাকে। এমন কি ইহাদের মধ্যে অনেকে আসল স্বরূপের খবরও রাখে না কাযেই নকল স্বরূপকে সর্ব্বস্ব বুঝিয়া লইয়া মায়ার ক্রীড়া-উদ্যানে বেড়াইতে বেড়াইতেই জীবন-লীলা শেষ করিয়া ফেলে কিন্তু জ্ঞানী নকল স্বরূপের দায় সম্পূর্ণরূপে এড়াইতে না পারিলেও আসল স্বরূপকেই জীবনের লক্ষ্য করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয় যদ্যপি অপ্রবুদ্ধ অবস্থাতেও আসল স্বরূপ ভাল মন্দে নির্লিপ্ত ও বিশুদ্ধই থাকে, তথাপি ঐ অবস্থার লোকেরা ইহ ধরিয়া লইতে না পারায় নকলের অধীনতা হইতে কিছুতেই অব্যাহতি পায় না আর নকলের অধীনতা পাশ ছিন্ন না করিতে পারিলে সংসারের মৃগতৃষ্ণাতেই যে কাল হরণ করিতে হয় তাহা কোন প্রকারে অসত্য মনে করা যাইতে পারে না কেননা নকল জীব যেরূপ মায়িক উপাদানে গঠিত, সেইরূপ মায়ার গন্ধর্ব্ব-নগর দেখিয়া আত্মহারা হইয়া পড়ে সে অভিমানে সুরাপান করিয়া এত উন্মত্ত হইয়া উঠে যে, আপনাকেই হর্ত্তা, কর্ত্তা, বিধাতা মনে করে এই পৃথিবীতে এই প্রকারের সুরা-পায়ীর দলই যে অধিক তাহাই বা কিরূপে অস্বীকার করিয়া থাকিতে পারা যায়। ধনী, দরিদ্র, শিক্ষিত, অশিক্ষিত সকল

সমাজেই উক্ত স্বরামতের কলহ শুনিতে পাওয়া যায় আর কলহের ফল যে অশান্তি ও সুশৃঙ্খলার অভাব তাহাও একটা খামখেয়ালী কথা বলিয়া উড়াইয়া দিতে পারা যায় না

এইরূপে জীবের নকল স্বরূপের অনুরাগী মহোদয়েরা মায়িক জিনিষের দিকে এইরূপভাবে ছুটিতে থাকে যে, তত্ত্বদর্শীর নিবৃত্ত হইবার উপদেশাবলীও নিষ্ফল হইয়া যায় পরিশেষে ইহারা এইরূপে ধারণা করিয়া বসে যে মজার সংসার ছাড়িয়া অপর চিন্তা করা নির্ব্বোধের কার্য্য। তিনিই এই জগতে বুদ্ধিমান যিনি ভোগ্য বস্তুর সম্যক্ উপভোগের জন্য সর্ব্বদা সতর্ক থাকেন কেননা ইহ ও ইহা দ্বারা যে সুখ লাভ হয় তাহা সকলেরই অনুভূতি-গোচর হইয়া থাকে। যদিও উভয়েই অনিত্য, তথাপি নিত্য সুখ বা বস্তু কথার কথামাত্র এই প্রকার ধারণা টা গজাইয়া উঠিলেই ক্রমনীতিতে 'যাবজ্জীবেৎ সুখং জীবেৎ' সিদ্ধান্তে স্বতই লোক উপনীত হইয়া পড়ে এবং ইহার ফলে অভিনব পশুতে পরিণত না হইয়া থাকিতে পারে না, এইজন্য যে মনুষ্যের বিশিষ্ট গুণ ধর্ম্মকেই তাহার হৃদয় হইতে বিদায় করিয়া দেয়

জীবের আসল ও নকল স্বরূপকে বিশ্লেষণ নীতিতে বুঝিয়া লওয়া একমাত্র তত্ত্বদর্শীর পক্ষেই সম্ভবপর। তিনিই ব্রহ্ম-বিচারজনিত তত্ত্বদর্শনের প্রভাবে নকলকে আসলে বিলীন করিয়া ফেলেন আর নকল স্বরূপের মূলে যে আসল স্বরূপ রহিয়াছে ইহা বিচারশীল ব্রহ্মনিষ্ঠ জিজ্ঞাসুও বুঝিতে পারেন। কেননা

কেবল আসল স্বরূপের সাক্ষাৎকার ও তদভাবেই জ্ঞানী এবং জিজ্ঞাসুর পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু ব্রহ্মজিজ্ঞাসু হইয়াও যিনি ব্রহ্মবিচারে তটস্থ থাকেন তাঁহার ভাগ্যে ব্রহ্মের অপরোক্ষ অনুভব হওয়া অতীব কঠিন যাহা হউক জীবের নকল স্বরূপ ব্যতীত আসল স্বরূপ যে মান বা মায়িক বস্তুর বন্ধনে আসে না একথা কোন প্রকারে অসত্য হইবার নহে নকল স্বরূপটা মায়ার ভেল্‌কীবাজিতে অঙ্গ ঢালিয়া দিলেও আসল স্বরূপ নিরন্তর একভাবে বর্ত্তমান থাকিয়া স্বয়ংই প্রকাশমান রহিয়াছে কিন্তু অজ্ঞানীর পক্ষে আবরণ ভঙ্গ না হওয়াতে উহা স্বয়ং প্রকাশ হইয়াও অপ্রকাশিতই থাকে একমাত্র উৎসন্নাবরণ জ্ঞানীই স্বয়ংপ্রকাশ চিদাত্মার অনাময় নিত্য আলোকের মহিমা বুঝিতে পারেন ইহা বুঝিতে পারিয়াই তিনি মায়িক জিনিষ প্রত্যক্ষতঃ দেখিয়াও উহাতে অনাসক্ত থাকেন অর এই অনাসক্তি হইতে ক্রমরীতিতে অনাত্মবস্তুর প্রতীতিকেও তিনি বিদায় করিয়া দেন এবং অবিশ্রান্ত ব্রহ্মসমুদ্রে নিমগ্ন হইয়া অবিলম্বে লোকের দর্শনপথ হইতে অন্তর্হিত হইয়া যান অর্থাৎ পদার্থাভাবনী ও তুরীয়গা ভূমিকা অতিক্রম করিয়া সার্দ্ধত্রিহস্ত শরীরের দায় হইতে একবারে মুক্ত হইয়া উঠেন

জীবন্মুক্তি সুখ

তত্ত্বদর্শী লোকহিতকর কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া জীবনযাপনায় অগ্রসর হইলে জনসমাজ যে তাহা হইতে সবিশেষ ভাবে উপকৃত হয় ইহাতে কোন সন্দেহ নাই কিন্তু যথাযথরূপে জীবন্মুক্তি সুখের অধিকারী হওয়া ও অবিরত ব্রহ্মচিন্তন করা তাঁহার পক্ষে সুবিধাজনক বলিয়া বোধ হয় না। ইহার কারণ এই যে ঐ কার্য্য অঙ্গহীন না হইয়া পূর্ণাঙ্গে হইবার জন্য তাঁহাকে অধিকাংশ সময় বহির্মুখ থাকিতে হয়। আর অন্তর্মুখ থাকিয়া যে ঐরূপ গুরুতর কার্য্য সুষ্ঠুভাবে সুসম্পন্ন করিতে পারা যায় না তাহার যথেষ্ট নিদর্শন রহিয়াছে। তবে যাহারা জনক রাজার উদাহরণ দিয়া আপন নির্লিপ্তভাব খ্যাপন করিয়া থাকেন তাঁহাদিগকে অধিকাংশ স্থলে বাচনিক জ্ঞানী হইতেই দেখা যায়। কাজেই এইরূপ অবস্থাতে যাহারা সর্ব্বদা ব্রহ্মনিষ্ঠ থাকিতে চাহেন তাঁহাদিগকে অবশ্যই বিষয়োপরামে সুদীক্ষিত হইতে হইবে। এইজন্যই দেখিতে পাওয়া যায় যে জাহ্নবীতীরে জ্ঞানী মহাপুরুষগণ অকিঞ্চন ব্রতে ব্রতী হইয়া বিষয় উপরামের পরাকাষ্ঠায় পৌঁছিয়া থাকেন। তাঁহাদের নির্জ্জন তরুতল, পর্ণশালা বা জীর্ণ মন্দিরে বাস, নগর বা গ্রাম হইতে মাধুকরী ভিক্ষা গ্রহণ এবং বিষয়ীর সঙ্গবর্জ্জন দর্শকের মনে ঋষিযুগের স্মৃতি লইয়া আসে। লোকৈষণা ও বিত্তৈষণার প্রলোভন

তাঁহারা কখন অপথে পদার্পণ করেন না। ব্রহ্মচিন্তন এবং
বেদান্তানুশীলন ব্যতীত অপর কোন লৌকিক কার্য্য বা চিন্তায়
তাঁহাদিগকে সময় নষ্ট করিতেও কম দেখা যায়। অবশ্যই
এইরূপ বিষয়োপরত যতি হইতে সবিশেষরূপে ঐহিক বা পার্থিব
ফলের আশা করা যাইতে পারে না। কিন্তু তাই বলিয়া এরূপ
সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া অনুচিত যে, তাঁহাদের জীবন, জগতের
কোন কার্য্যেই আসিবার নহে। কেন না এই প্রকারের
মহাত্মা হইতেই আধ্যাত্মিক জীবনের নিদর্শন পাওয়া যায়।
যদিও ইহাদের মধ্যে অনেকে অনধিকারীকে অধিকারী করিবার
জন্য উপদেশ বা শিক্ষা দিতেও কুণ্ঠিত নহেন, তথাপি তাঁহা-
দের দর্শন দর্শকের হৃদয়ে আধ্যাত্মিকভাব সঞ্চারিত না করিয়া
ছাড়ে না। আর যাহার দর্শনে এই ভাব মনে না আসে
তাঁহার মহাপুরুষত্বেই সন্দেহ। যাহা হউক, বিষয়োপরতি যে
জীবন্মুক্তি সুখের অব্যভিচারী কারণ ইহা জীবন্মুক্ত তত্ত্বদর্শীর
নিকটে শুনিতে পাওয়া যায়। সুতরাং সুবর্ণ মুদ্রার গণন,
ভূসম্পত্তির বর্দ্ধন ও রাজকীয় উচ্চপদ গ্রহণ যে ঐ সুখ আনিয়া
দিতে পারে না তাহা বুঝিতে বাকি রহিল না। আর যাঁহারা
এই তিনটীর মধ্যে একটীর গৌরব লইয়াই ব্যতিব্যস্ত থাকেন
তাঁহাদিগকে অবসাদ-হিমে অবশঅঙ্গ না হইয়া প্রফুল্লিত দেখা
যায় না। অনিষ্ট ঘটনার আবির্ভাবে সুখের ম্লান ভাবই বুঝাইয়া
দেয় যে, এইজন্য স্বগতভাবে তাঁহারা বিষাদে অবসন্ন হইতে-
ছেন। তবে ইহা সত্য যে, অনুগত বা স্বার্থান্বেষী জনতা

তাহঁ দিগকে অভি• ব মনকে পরিণ৩ ন। করিব চাড়ে ন কেন ন সংসারে সম্পদের অনির্ব্বচনীয় প্র৩া৭ সম্পদ দোষকে যবনিকার অন্তরালে রাখিব গুণে ব হৃদ•গ্রাহী অভিনয় দেখাইবা কাহাকে ন বিমোহিত করে ?

মায়িক ব্যাপারে আসক্ত ব নিযুক্ত থাকিঃ যে জীবন্মুক্তি সুখের ভাগী হইতে পার। যার তাহার কোন উদাহরণ পাওয়া যায় ন তবে সখের জ্ঞানী ব বকজ্ঞানীর কথার বিশ্বাস করিবার কথ স্বতন্ত্র যে কারণেই হউক, মানুষ বহির্মুখতায় এত অভ্যস্ত হইয় পড়ে যে, বহু কষ্টেও সে মনকে অন্তর্মুখ করিতে পারে ■ আর ইহাতেও যদি 'কর্ত্তিত ক্ষতে লবণাক্ত জল সেচন নীতিতে' বহির্ব্বস্তু লইয়াই জীবনের খেল খেলিতে থাকে, তবে কে তাহ হইতে জীবন্মুক্তি সুখের আশা করিয়া আপন বিকৃত মস্তিষ্কের পরিচয় দিতে যায় ? কিন্তু ঐরূপ জ্ঞানীদিগের কথায় বিশ্বাস করিতে পারিলে বিষয়াসক্ত জীবের পক্ষে হৃদবোধ জন্মাইবার সুযোগ ঘটে । যাহাই হউক, পার্থিব বিষয় হইতে অবসর গ্রহণ ন করিলে প্রকৃত জীবন্মুক্তি-সুখ সুদূরপরাহতই থাকিয়া যায় এইজন্য যে বিষয়াসক্তি আসিয়া অজ্ঞাতসারে মনকে অনাত্মবস্তুর নাট্যশালা করিয়া তুলে কেন ন, এই পৃথিবীতে যদি ব্রহ্মধ্যান করিতে যাইয়া বিষয়ের ধ্যান ন করেন এইরূপ ব্যক্তি কমই দেখিতে পাওয় যায় নির্লেপভাবে রাজ্য বিচালন সম্বন্ধে যে সকল প্রাচীন কাহিনী শুনিতে পাওয় যায় ঐগুলি জ্ঞানীর অর্থবাদ

মান। আর সন্ন্যাসআশ্রমই সূচনা করিয়া দিতেছে যে সংসারের কার্য্যে লিপ্ত থাকিয়া জীবন্মুক্তি সুখলাভ করিতে পারা যায় না। তবে ইহা সত্য যে ইদানীন্তন কালে অনেক অযোগ্য ব্যক্তিরাও এই আশ্রম গ্রহণ করিয়া থাকেন। কিন্তু তাই বলিয়া এই আশ্রমের যে কোন আবশ্যকতা নাই তাহা ব্যক্ত করায় মূর্খতারই সূচনা হয়। কেন না ত্রিকালদর্শী ঋষিগণকে এই আশ্রমের বিধানের মূলে দেখিতে পাওয়া যায়। এবং যখন কোন বৈষয়িক সুখ বা কল্যাণকে ইহার উদ্দেশ্য বলা যাইতে পারে না, তখন বাধ্য হইয়া বলিতে হয় যে, জীবন্মুক্তি সুখলাভ করাই এই আশ্রমের প্রধান উদ্দেশ্য। কে না জানে যে, এই আশ্রমের প্রভাবেই বুদ্ধ ও শঙ্কর প্রভৃতি মহাপুরুষের পদস্পর্শে আর্য্যভূমি পবিত্র হইয়াছে ?

জীবন্মুক্তির প্রথম অবস্থাতে অবশ্যই কোন না কোন সময়ে মনে বিষয় চিন্তা আসে, কিন্তু বিষয়াসক্তি কখন উহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। এই অবস্থাতে জ্ঞানী শরীরধারণোপযোগী ব্যবহার উপেক্ষা না করিতে পারিলেও অধিকাংশ সময় অন্তর্মুখ থাকেন। ব্রহ্মাত্মার বিচারচিন্তন ও অনুভবই তাঁহার প্রধান লক্ষ্য হয়। দ্বিতীয় অবস্থাতে তাঁহার মনে কখন বিষয় চিন্তা আসে না, এইজন্য তিনি সর্ব্বদা অন্তর্মুখ থাকেন। শরীর রক্ষার্থ যৎকিঞ্চিৎ ব্যবহার তাঁহার দেখিতে পাইলেও উহা তাঁহাকে বহির্মুখ করে না। পূর্ব্ব অভ্যাসের বেগে ঐ ব্যবহার যেন স্বতই সম্পন্ন হইয়া যায়। তৃতীয় অবস্থাতে তিনি

নিরন্তর সমাহিত অর্থাৎ সমাধিতে মগ্ন থাকেন। কাজেই তাঁহাকে ব্যবহার নির্ম্মুক্তই দেখিতে পাওয়া যায়। এই অবস্থা ত্রয়কে যথাক্রমে অসংসক্তি, পদার্থাভাবনী এবং তুর্য্যগাও বলা যাইতে পারে।

প্রকৃত পক্ষে অবস্থা মায়িক এবং মুক্তি ব্রহ্মরূপ বলিয়া বিদেহমুক্তি ও জীবন্মুক্তি প্রভৃতি সংজ্ঞা মুক্তিকে দেওয়া বিবেকানুমোদিত হইতে পারে না। কারণ তত্ত্বদর্শন হইবামাত্রই যখন মায়া বা মায়িক জিনিষের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই এইরূপ বাধকজ্ঞান স্বতঃই আবির্ভূত হয়, তখন ব্রহ্মরূপ মুক্তিতে কি প্রকারে মায়িক অবস্থার সামঞ্জস্য হইতে পারে? তবে শ্রুতিতে যে জীবন্মুক্তি উপদিষ্ট হইয়াছে তাহার তাৎপর্য্য জ্ঞানীর প্রশংসা ভিন্ন অপর কিছু নহে। যাহাই হউক অজ্ঞান দৃষ্টিতে জীবন্মুক্তি প্রারব্ধ লেশ বিদ্যা কল্পিত হইলেও জ্ঞানীর বিবেচনায় অখণ্ড ব্রহ্মসত্তা ব্যতীত মায়া বা মায়িক বস্তুর সত্তা অভাবগ্রস্তই বটে। অধিকন্তু অজ্ঞানীকে লক্ষ্যে যে বাক্যাবলীর জন্য বেদান্তশাস্ত্রে যে অনেক কথা বলা হইয়াছে তাহা তত্ত্বদর্শী ধরিয়া লইতে পারেন। যে কেবল উহার উপরে ভাসিতে থাকে এবং আক্ষরিক অর্থ লইয়া ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়ে। আর কেবল আক্ষরিক অর্থ লইয়া চলিলে বেদান্তের প্রত্যেক স্থলের সুসঙ্গতি বজায় রাখা এক প্রকার অসম্ভব। কাজেই প্রকৃত অর্থ অবগত হইবার জন্য শ্রোত্রিয় ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুর নিকট বেদান্ত-শাস্ত্রের অধ্যয়ন করা উচিত। ইদানীং গুরু বলে দেখিতে পাই

যে, অনেকেই কেবল তাঁহার বুদ্ধিবলে বেদান্ত পড়েন আর ইহা নিষ্ফল না হইলেও আশানুরূপ ফল আনয়ন করিয়া তাঁহাদের হৃদয়ে শান্তি ঢালিয়া দিতে পারে না এই শ্রেণীর মধ্যে এইরূপ ব্যক্তিও দেখিতে পাওয়া যায়, যিনি ব্রহ্মসাক্ষাৎকার না করিয়াও আপনাকে জ্ঞানী মানিতে কুণ্ঠিত হন না যাহাই হউক, তাঁহারা যে বেদান্ত শাস্ত্রের অনুশীলন করিতেছেন এই জন্য তাঁহাদিগকে অবশ্যই ধন্যবাদ দিতে হইবে কেন না ইহা ক্রমনীতিতে অধ্যেতাকে সৎপথে না আনিয়া ছাড়ে না তবে চিদাত্মা পরব্রহ্মকে হস্তামলকের ন্যায় ধরিয়া লওয়া যে সকলের কর্ম নহে তাহা অতীব সত্য এইরূপে মুক্তি যে অবস্থাতীত এক অখণ্ড বস্তু তাহাতে কোন সন্দেহ না থাকিলেও অজ্ঞানীকে আশ্বাস দিবার জন্য তাহার জীবন্মুক্তি প্রভৃতি আখ্যা কল্পিত হইয়াছে

জ্ঞানের রাজত্ব।

যে দিকে দেখা যায় সে দিকেই জ্ঞানের অদম্য অনাময় প্রতাপ। যেরূপ সূর্য্য, চন্দ্র, তারকা প্রভৃতি জ্যোতিষ্ক, জ্ঞান সমুদ্ভাসিত তদ্রূপ জল, স্থল, মধ্যখানেও জ্ঞানের মহিমা দেখিতে পাওয়া যায় যখন অতি নিকটস্থ জিনিষের ন্যায় বহুদূরস্থ দূরবীক্ষণ লক্ষ্য বা তদলক্ষ্য তারকাও জ্ঞানদ্বারা প্রকাশিত হইতেছে,

তখন উহাকে কেমন করিয়া বিশ্বব্যাপী না বলিয়া থাকিতে পারা যায় ? কেন না পরিচ্ছিন্ন বস্তু নিমেষের মধ্যে এতদূরে পৌঁছিতে পারে না। যে কোন জ্ঞেয় বস্তুর সম্বন্ধে ভাবা যায়, তাহাই জ্ঞানের অপরিহার্য্য ব্যাপ্তির চতুঃসীমার মধ্যে বর্ত্তমান বলিয়া সাব্যস্ত হয়। কল্পাশক্ত নিবৃত্তিক্রিয়ার স্থায় জ্ঞানহীন জ্ঞেয় বস্তু কেবল কথার কথা মাত্র। সুতরাং যাহা জ্ঞানের অপেক্ষা রাখে না এইরূপ বিষয় কখন প্রমাণিত হইবার নহে। বৈশেষিকের পরমাণু, স্থায়ের বিশ্বনির্ম্মাতা ঈশ্বর ও সাংখ্যের প্রকৃতি, সকলেই প্রতিপন্ন হইতে জ্ঞানের আশ্রয়ে আসে। ইহার আশ্রয়ে না আসিলে ঐগুলির কোন মূল্যই থাকে না। কাজেই পাতঞ্জলির পুরুষবিশেষ ঈশ্বরও জ্ঞানের দাবি এড়াইয়া অপনাকে ভক্তমণ্ডলীর হৃদয়ের অধিষ্ঠাতা দেবতা করিতে পারেন।

জ্ঞান স্বরূপতঃ এক অখণ্ড হইয়াও বিবিধ অসংখ্য বিষয়কে আপন আশ্রয়ে রাখে। আশ্রিত বিষয়গুলি ক্ষণে আত্মলাভ করিয়া অদৃশ্য হইয়া যাইতেছে কিন্তু জ্ঞান স্বয়ং অনাদি অনন্ত কালের জন্য অমর হইয়া রহিয়াছে। তথাপি অবোধ মানব বিষয়ের উৎপত্তিবিনাশ জ্ঞানে আরোপ করিতে ছাড়িতেছে না। তাহারা বিষয়ের আপাত সুন্দর আকৃতি ও প্রকৃতি দেখিয়া এত বিমোহিত হইয়া পড়িয়াছে যে, কিছুতেই জ্ঞানের বিষয়াতীত প্রকৃত স্বরূপ ধরিয়া লইতে পারে না। পরিশেষে তাহাকে বিষয়ের সহিত একাকার করিয়া তাহার উপরে বৃথা ইহার সমধর্ম্মত্বের কলঙ্ক লাগায়। জ্ঞানকে একই ভাবে প্রত্যেক

বিষয়ে অনুস্যূত দেখিয়াও অবিদ্যার প্রেরণায় এই অহিজ্ঞান কী নকুলজ্ঞান এইরূপ প্রণালীতে নাম করিয়া তুলে অবশ্যই নকুল হইতে অহি ভিন্ন জিনিষ, কিন্তু উভয়ের প্রকাশরূপ জ্ঞানকে কিছুতেই ভিন্ন প্রকৃতি বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে পারা যায় না কেনন অহির অনুভূতিটা বক্রাকৃতি ও কৃষ্ণবর্ণ এবং নকুলের অনুভূতি গোলাকৃতি ও ধূসরবর্ণ এইরূপ বলাতে মস্তিষ্কের বিকৃতিই সূচিত হইয়া থাকে

বিশ্বব্যাপী জ্ঞান অন্তরে ও বাহিরে পরিপূর্ণ থাকিলেও মানুষ তাহাকে মস্তকের সম্পত্তি বলিয়াই মনে করে জ্ঞান যেন মস্তকের ভিতরে থাকিয়াই দূরস্থ ও নিকটস্থ বিষয় রাশির খবর জানিয়া দেয় এই বিষয়টি বিবেচনা পূর্ব্বক ভাবিয়া দেখিলে ইহা সাব্যস্ত হয় যে জ্ঞান অখণ্ড চির অমর হইলেও মস্তিষ্ক-উপাধি যোগে উহা বিষয় সমূহের প্রকাশ করে তাহাকে মস্তিষ্কের সাময়িক গুণ এই জন্য বলিতে পারা যায় না যে, যখন গুণকে গুণের পূর্ব্বভাবী হইতে দেখা যায়, তখন মস্তিষ্ক নিজে প্রতিপন্ন হইবার জন্য জ্ঞানকেই আপনার পূর্ব্ববর্ত্তী করিয়া তুলিতেছে অর্থাৎ জ্ঞান ব্যতীত মস্তিষ্ক সিদ্ধি না হওয়াতে বাধ্য হইয়া জ্ঞানকে মস্তিষ্কের পূর্ব্বভাবী বলিতে হয় জ্ঞান পূর্ব্বভাবী জিনিষ যে পরভাবী বস্তুর গুণ হইতে পারে তাহার কোন উদাহরণ পাওয়া যায় না এই স্থলে অবশ্যই ইহা উত্থাপন করা যাইতে পারে যে, সদ্যোজাত রামের মস্তিষ্ককে প্রতিপন্ন করিবার জন্য শ্যামের জ্ঞানের আবশ্যকতা

হইলেও ঐ জ্ঞানটা তাঁহারই মস্তিষ্কের সম্পত্তি। কিন্তু বীজাঙ্কুর স্তায়ে উভয়কে অনাদি বলিলেও জ্ঞানকে পূর্ব্বভাবী স্বীকার না করিয়া সহভাবী স্বীকার করিতেই হইবে। যে রূপ মস্তিষ্ক ব্যতিরেকে জ্ঞান দেখা যায় না তদ্রূপ কোন না কোন জ্ঞান যাহাকে বিষয় করে, এই রূপ মস্তিষ্কও দৃষ্টি পথে আসিবার নহে। কেনন মৃত ব্যক্তির মস্তিষ্কও কোন জীবিত ব্যক্তির জ্ঞান হইতেই প্রতিপন্ন হইয়া থাকে। কাযেই প্রথমে মস্তিষ্ক পরে জ্ঞান এই প্রকার উক্তিকে আপ্ত বাক্য বলিয়া মানিয়া লইতে পারা যায় না।

পূর্ব্ববর্ত্তী জড়কে পরভাবী জ্ঞান দ্বারা প্রতিপন্ন করিতে গেলেও এইরূপ প্রশ্ন আসে যে পূর্ব্ববর্ত্তী জড় ঐ জ্ঞান উৎপত্তির পূর্ব্বে অপর কোন জ্ঞানের গোচর ছিল কিনা। ইহাতে যদি বলা যায় যে না, তবে উহার পূর্ব্ববর্ত্তিত্বই অসিদ্ধ হইয়া উঠে এই জন্য যে, এমন বিষয় অদ্যাপি দৃষ্টি পথে আসে নাই যাহা সমকালিন কোননা কোন জ্ঞানের গোচর নহে। সুতরাং নিরবচ্ছিন্ন বা জ্ঞান-নিরপেক্ষ জড় পূর্ব্বে ছিল পরে উহার ক্রমবিকাশে জ্ঞান আবির্ভূত হইয়াছে এইরূপ মত যুক্তিমূলক বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে পারে না। ইহা হইতে এইরূপ সূচিত হইতেও বাকি রহিল না যে, ঈশ্বর নিরপেক্ষ অতি-পরমাণুবাদও কেবল কল্পনার বাজীকরী বুঝাইয়া দেয়। অন্ধ-বিশ্বাস বা কল্পনার প্রলোভনে না পড়িয়া যদি বিশুদ্ধ যুক্তির সাহায্যে বিচার করা যায়, তবে জ্ঞান ও জড় উভয়েই অনাদি সিদ্ধ

হইয়া উঠে তবে উভয়ের মধ্যে এইরূপ পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায় যে, প্রথম—নিত্য,একভাবাপন্ন,অখণ্ড সর্বানুস্যূত ও স্বয়ংপ্রকাশ হইয়া সর্বপ্রকাশক এবং দ্বিতীয়—অনিত্য,নানা বিভাজ্য, পরিচ্ছিন্ন ও জ্ঞানদ্বারা প্রকাশিত হইয়া স্বতন্ত্র সত্তা শূন্য। কাযেই দ্বিতীয় জ্ঞানের সত্তা ব্যতীত নিজে কোন স্বতন্ত্র সত্তা রাখে না এবং উহার গোচর হয় বলিয়া অনির্ব্বচনীয় মায়া আখ্যা লাভ করিয়াছে। মায়া প্রবাহরূপে অনাদি অনন্ত বলিয়া ইহার কোন স্থিতিশীল স্বরূপ অনুসন্ধানে না পাইলেও ইহাকে কখন পরিবর্ত্তনশীল বা পরিণামগ্রস্তস্বরূপে বর্জ্জিত হইতে দেখা যায় না। যদিও এই স্বরূপটার কোন স্বগত পৃথক্ সত্তা ধরিয়া লইতে পারা যায় না, তথাপি প্রতীয়মান হয় বলিয়া প্রাতিভিক সত্তা স্বীকার করা হইয়াছে। কিন্তু এই সত্তাটাও ব্রহ্মসত্তা হইতে কোন পৃথক্ জিনিষ নহে কেননা সত্তাজ্ঞান ও ব্রহ্ম ইহারা সকলেই এক অখণ্ড জিনিষ হওয়াতে প্রতীয়মান বস্তুর সত্তা ব্রহ্মসত্তা বলিয়াই বিচারে সাব্যস্ত হয়। আর সত্তা যে জ্ঞানতাদাত্ম্যশালী ইহা পূর্ব্বে বলা গিয়াছে। সত্তা বল আর ব্রহ্ম বল,উভয়ই জ্ঞানরূপে ধরা পড়ে। জ্ঞানকে বাদ দিয়া দেখিলে যেরূপ সত্তা বলিয়া কোন জিনিষ দাঁড়ায় না, সেইরূপ ব্রহ্মও কেবল কথারই শ্রীবৃদ্ধি করিয়া থাকেন। কাযেই জ্ঞান সত্তা, জ্ঞান ব্রহ্ম এবং জ্ঞান আনন্দ শব্দের অভিধেয়। এমন কি জ্ঞান ছাড়া নিত্যবস্তু ত্রিজগতে নাই। আর প্রতীতির সময়ে যাহা আছে বলিয়া বোধ হয়, উহাও মায়া বা মায়িক বস্তুর অন্যতর। এই

অন্তত্তর যেরূপ জ্ঞানে প্রকাশিত, সেইরূপ উহাকেই আপনার আসল স্বরূপে পরিণত করিয়াছে। কেননা ইহার বিশ্লেষণ করিতে যাইয়া জ্ঞান ব্যতীত অপর কোন সার অংশ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। যদিও বিবিধ গুণের স্তর দেখিতে পাওয়া যায়, তথাপি পরীক্ষার কষাঘাতে ঐগুলি চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া পড়ে। অর্থাৎ ঐগুলি ক্ষণভঙ্গুর ইন্দ্রিয়বোধ বা মনোবোধে পরিণত না হইয়া থাকে না।

অপ্রবুদ্ধ অবস্থাতে জ্ঞানের প্রকৃত তত্ত্ব বুঝিয়া উঠিতে পারা যায় না। এইজন্য মণি মুক্তা প্রভৃতি বিষয়ের স্বরূপকেই ঐ অবস্থার লোকেরা জ্ঞানের স্বরূপ বলিয়া মনে করে। যোগাচার ও মাধ্যমিক বৌদ্ধগণ এইজন্যই বহির্জগৎ অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়াও ক্ষণভঙ্গুর বিষয়ের স্বরূপকে জ্ঞানের স্বরূপ বলিয়া বুঝিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা মায়িক বস্তুকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করিয়া গেলেও মায়াতীত পুরুষকে ধরিয়া লইতে পারেন নাই। জ্ঞানরূপ আত্মাকে জীবনসমষ্টিরূপ মনে করাতে এবং স্থায়ী বস্তুকে বুঝিয়া লইবার অধ্যবসায় ও যত্নের ক্রটিতে তাঁহাদের এইরূপ বিসম্বাদ ঘটিয়াছিল বলিয়া বোধ হয়। কেননা কোন অবস্থাতে বা কোন কালে জ্ঞানের সামান্যাভাব দেখিতে পাওয়া যায় না? সুষুপ্তিতে যে জ্ঞান বর্ত্তমান থাকে তাহার সূচনা পূর্ব্বে করা গিয়াছে। কাযেই বাধ্য হইয়া বলিতে হয় যে বৌদ্ধগণ আধ্যাত্মিক বিষয়ে অধিক দূর অগ্রসর হইয়াও উপনিষদেদ্য পুরুষের স্বপ্রকাশ জ্যোতিতে বঞ্চিতই রহিয়া গিয়া-

ছিলেন। তবে ইহা সত্য যে, জগতের লোক দার্শনিক বিষয়ে তাঁহাদের নিকটে চিরদিনের তরে কৃতজ্ঞ থাকিবে কোন্ দার্শনিক তাঁহাদের স্বতন্ত্র গভীর যুক্তির প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারেন?

ব্যুত্থান অবস্থাতে জ্ঞানকে বিষয়ের প্রকাশরূপে বুঝিতে পারিলেও প্রকাশকে বিষয় হইতে সুস্পষ্টরূপে পৃথক্ করিয়া ভাবিয়া লওয়া অত্যন্ত কঠিন কেননা মনে এইরূপ তর্ক আসে যে যেরূপ জ্ঞান স্বয়ংপ্রকাশ বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে, সেইরূপ বিষয় সম্বন্ধে এই প্রকার বলিলেও চলে যে, স্বপ্রকাশ বিষয়সমূহ ক্ষণে উৎপত্তি ও স্থিতি লাভ করিয়া বিনষ্ট হইয়া যাইতেছে। আর যখন জ্ঞানকে স্বয়ংপ্রকাশ বলিলে প্রকাশ জ্ঞান হইতে অতিরিক্ত বলিয়া প্রতিপন্ন হয় না, তখন বিষয়কে স্বপ্রকাশ স্বীকার করিলে কিরূপে তাহার প্রকাশ, তাহা হইতে পৃথক্ জিনিষ বলিয়া প্রথিত হইতে পারে? এইরূপ তর্কের সমূলে অবসান হওয়া একমাত্র সমাধিস্থ ব্যক্তির পক্ষেই সম্ভবপর কেননা সমাধিতে মন যাইয়া জ্ঞানে বিলীন হইয়া পড়ে তথাপি অসমাধিস্থ সূক্ষ্ম বুদ্ধি কোন বস্তুর অভাবকে যখন অনুভব করেন, তখন ঐ অভাবটার প্রকাশ যে ঐ অভাবরূপ নহে কিন্তু ভাবরূপ স্বতন্ত্র বস্তু ইহা বুঝিতে পারে, এইজন্য যে প্রকাশকে অভাব বলিলে তাহার কোন মূল্যই থাকে না। এইরূপে বিভিন্ন বস্তুদ্বয়ের অনুভূতির সন্ধিস্থলেও জ্ঞানের বিষয়াতিরিক্ত স্বরূপ ধরা পড়ে। পরন্তু অন্তর্বস্তু বহির্বস্তুর ন্যায় অব-

বল বিশিষ্ট নহে এইজন্য সতর্কতা ও ধৈর্য্য সহকারে জ্ঞানের বিষয়াতিরিক্ত স্বরূপ নির্ব্বাচন করিতে হইবে। এবং নির্ব্বাচন-ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া গেলেও ঐ বিষয় লইয়া বারম্বার আলোচনা করা উচিত এইজন্য যে ইহা না করিলে ঐ স্বরূপকে ভুলিয়া যাইবার সম্ভাবনা আছে।

গৌড়পাদ ও শঙ্কর প্রভৃতি অদ্বৈত আচার্য্যগণ কেবল যুক্তি, তর্ক ও গ্রন্থের পত্রোদঘাটন লইয়াই কাল হরণ করেন নাই, কিন্তু ব্রহ্মাভ্যাস এবং যোগে নিরত হইয়া পরিশেষে নির্ব্বিকল্প সমাধিতে পৌঁছিয়াছিলেন। কাজেই যেরূপ যুক্তি তর্কের সাহায্যে বেদান্ত শাস্ত্রের অধ্যয়ন ও তাহার বিচার করিতে হইবে, সেইরূপ মনকে বিক্ষিপ্ত অবস্থা হইতে একাগ্র ও নিরুদ্ধ অবস্থায় লইয়া যাইবার জন্যও ধৈর্য্য ও অধ্যবসায় সহকারে চেষ্টা করা উচিত। তবে ইহা সত্য যে অধ্যয়ন ও বিচারে এইরূপ কষ্ট পাইতে হয় না। কিন্তু প্রাঙ্গণে মধুমক্ষিকার চাক না পাইলে অবশ্যই মধুপ্রার্থীকে পর্ব্বতে যাইতে হয়। আর যখন সামান্য লৌকিক সুখই প্রথমে কষ্ট না করিলে লব্ধ হইবার নহে, তখন নিত্য ব্রহ্মসুখ কি প্রকারে অনায়াসে মানুষ পাইতে পারে? যেরূপ ন্যায়, বৈশেষিক, সাংখ্য, পাতঞ্জল, পূর্ব্ব মীমাংসা ও উত্তর মীমাংসা ভাল করিয়া পড়িয়া ফেলিলেও মনোনিগ্রহ ব্রতে ব্রতী হওয়া ব্যতীত বিক্ষিপ্ত অবস্থা অতিক্রম করিতে পারা যায় না, সেইরূপ এই অবস্থায় পড়িয়া থাকিলে মনের বিষয়াকার পরিণাম কিছুতেই মিটিবার নহে। কাজেই

নির্ব্বিষয় জ্ঞানকে কূরস্থ কনক বলয়ের ন্যায় ভাবিয়া লইতে চিত্তের একাগ্র ও নিরুদ্ধ পরিণাম অতীব আবশ্যক

ইদানীন্তন সময়ে পাশ্চাত্য রীতির অনুকরণে নব্য সমাজ এত অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন যে পড়া লিখা ব্যতীত কোন আধ্যাত্মিক সাধন তাঁহাদের মন আকৃষ্ট করিতে পারিতেছে না। নির্জ্জনে বসিয়াও অনেকে কেবল মনের মায়িক ব বৈষয়িক পরিণাম বাড়াইয়া থাকেন এমন কি ঈশ্বরচিন্তন করিতে যাইয়াও মনঃপ্রান্তরে বিষয়ের হাট লাগাইয়া বসেন যদিও এই হাট লাগাইবার প্রণালীটা অভিনব, তথাপি ইহা যে তাঁহাদের বহির্মুখতার বৃদ্ধি করে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। মনের বিষয়াকার পরিণাম ক্রমনীতিতে মিটানই নির্জ্জন সেবনের উদ্দেশ্য সুতরাং নির্জ্জনে থাকিয়াও যিনি এই পরিণাম লইয়াই কাল হরণ করেন, তাহাকে কিছুতেই সুবিবেচক বলা যাইতে পারে না তবে ইহা সত্য যে তত্ত্বজ্ঞান না হইলে কোন না কোন মায়িক বস্তু লইয়াই মন ক্রীড়া করিতে থাকে কিন্তু এই স্থলেও একই বস্তুতে বলপূর্ব্বক মনকে লাগাইয়া দিতে হইবে এইজন্য যে ইহা দ্বারা ক্রমশঃ বিক্ষিপ্ততা কমিতে থাকে। নিরাকার সগুণ ঈশ্বর বা সাকার শক্তি, শিব, বিষ্ণু প্রভৃতি ঈশ্বর মায়িক হইলেও অপর বিষয় হইতে মন আকুঞ্চিত করিয়া ইঁহাদের প্রতি লাগাইতে পারিলে ক্রমনীতিতে ব্রহ্মদর্শন করিতে পারা যায় কেননা নির্দ্দিষ্ট ঈশ্বরের ধারাবাহিক ধ্যানে কৃতকার্য্য হইতে পারিলে মন বিক্ষিপ্ত অবস্থা হইতে অব্যাহতি

পাইয়া একমুখ হইয়া যায়। আর একমুখ মন বিচারের প্রভাবে নির্ব্বিঘ্নে স্বয়ংপ্রকাশ জ্ঞানরূপ ব্রহ্মকে প্রত্যক্ষত ধরিয়া লইতে পারে কাযেই সগুণ ব্রহ্মের উপাসনাকেও তত্ত্বজ্ঞানের সহায়ক বলিলে অন্যায় হইবার নহে তবে নির্গুণ ব্রহ্মকে প্রত্যক্ষত ধরিয়া লইতে না পারিলে পরম পুরুষার্থে বঞ্চিতই থাকিয়া যাইতে হয় আর নির্গুণ ব্রহ্ম যে নিরন্তর প্রকাশ-মান জ্ঞান ব্যতীত অপর জিনিষ নহে তাহা পুনঃপুনঃ বলা গিয়াছে।

এইরূপে কি লৌকিক বিষয়ে কি আধ্যাত্মিক বিষয়ে যে দিকেই দেখা যায়, সেই দিকেই জ্ঞানের প্রভুত্ব প্রতিপন্ন হইয়া পড়ে। জ্ঞানের শাসনে না থাকিলে যেরূপ আধ্যাত্মিক কার্য্যে পদে পদে লাঞ্ছিত হইতে হয়, তদ্রূপ লৌকিক কার্য্যও উহা ব্যতীত আত্মলাভ করিতে পারে না। নিমেষ কালও যদি জ্ঞানের শাসন না থাকে, তবে জগৎ শূন্যে পরিণত হইয়া যায় ইহার দৃষ্টান্তে ন্যায়ের সুষুপ্তিকে রাখা যাইতে পারে। বেদান্ত মতে সুষুপ্তি অবস্থাতে কারণরূপ অবিদ্যা ব্যতিরেকে কার্য্য-জগতের তিরোভাব স্বীকৃত হইলেও জ্ঞানের স্থায়ীভাবে কোন বিভাব সূচিত হয় নাই আর যখন যাহা জ্ঞানের আশ্রয়ে অবস্থিত নহে এরূপ জিনিষ দেখিতে পাওয়া যায় না, তখন উহার বিশ্বব্যাপী রাজত্বে কি সন্দেহ আছে? কিন্তু লৌকিক রাজত্বে রাজারও অস্তিত্ব রাজার উপর নির্ভর করিতে দেখা যায় না এবং এই রাজত্বে দেখা যায় এইজন্য উভয়ের ইতর বিশেষ

অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে জ্ঞানরাজ্য আপন প্রকৃতি-পুঞ্জকে কেবল অধীন ভাবে রাখিয়াই ক্ষান্ত হন নই, কিন্তু জীবন মরণের ভারও নিজেই বহন করিতেছেন কেননা নিখিল বস্তুর উৎপত্তি ও বিনাশ জ্ঞানকেই অবলম্বন করিয়া হইতে দেখা যায় এই রাজ স্বয়ংই আশ্রিত প্রজাদিগকে অবিরত নজরবন্দী করিয়া রাখিয়াছেন। এইরূপ নিরঙ্কুশ প্রভুত্বের উদাহরণ জগতে কোথায় পাওয় যায়? আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে এইরূপে প্রভুত্ব করিয়াও দর্শন মাত্রেই মানুষের নিখিল দুঃখ ঘুচাইয়া দেন ইঁহার দর্শন করিব মাত্রই দর্শক পরমানন্দে নিমগ্ন হইয়া যায়

জ্ঞানরূপ ব্রহ্মাত্মার ধারাবাহিক অনুভবের অভ্যাস করিতে গেলে প্রথমে প্রণব ব অনাহত ধ্বনির সাক্ষীর উপরে মন লাগাইতে হইবে অবশ্যই এই অবস্থাতেও অপরাপর বিষয় আসিয়া মনে আসন জমাইয়া বসিবে, কিন্তু সতর্কতার সহিত উহাকে মন হইতে বলপূর্ব্বক দূর করা আবশ্যক কেননা অসতর্ক হইবামাত্র ঐ সাক্ষী এবং সাক্ষ্যকে ভুলিয়া মন বিষয়-রাশির ক্রীড় উদ্যানে পরিণত হইয় পড়ে এইরূপে জ্ঞান-ভ্যাস করিতে থাকিলে নিশ্চয়ই এইরূপ অবস্থা আসিবে যাহাতে সমস্ত জগৎটা জ্ঞানরূপে পরিণত না হইয় থাকে না ইহাতে জ্ঞান হইতে বিষয়ের পৃথক্ ভাব ধরিয়া লইতে পারা যায় না। যদিও এই অবস্থা সাময়িক, তথাপি ইহা যেরূপ লোকোত্তর আনন্দ লইয় আসে, তদ্রূপ অদ্বৈতব্রহ্মে অটল বিশ্বাস না

আমির ছাড়ে না । একবার এই অবস্থা প্রাপ্ত করিতে পারি-লেই নিখিল সন্দেহ স্বতই সুদূরপরাহত হইয়া যায়। কাযেই যিনি অসকৃৎ এইরূপ ভূমিকায় উপনীত হইয়াছেন, তিনি যে ব্রহ্মনিষ্ঠ মহা মুনি তাহাতে আপত্তি করিবার কি থাকে